*তাজকিরায়ে সাহাবা*

***দোসরা হিসসা***

সংকলন: আবু কাব আনীসুর রহমান বিন আব্দুল কুদ্দুস

 1438হিজরী 2017 ইংরেজি

abukab.weebly.com

ভূমিকা

আব্দুল্লাহ বিন মাছঊদ

আবূ হুরাইরা

হুজায়ফা ইবনু ইয়ামান

আবূ হুমাইদ সায়ীদী

ফীরোজ দায়লামী

ছাওবান

আবূ রাফে আছলাম

মাবূর কিবতী

জুমিখমার

ছাফীনা

আবূ বকরা ছাকাফী

সাওদা

আয়িশা

হাফছা

জয়নাব বিনতে খুজায়মা

উম্মে হাবীবা

জয়নাব বিনতে জাহাশ

জুওয়াইরিয়্যা

ছাফিয়্যা

মায়নূনা

**ভূমিকা**

আল্লাহকে শুকরিয়া জানাচ্ছি। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ (স)-এর উপর, তিনিই নবীগণের শেষ; তার পরে কোন নবী নেই।

আল্লাহর দয়ায় তাজকিরা সাহাবার দোসরা হিস্যা লিখেছি। আগের পর্বে সাহাবীদের মযাদা সম্পর্কে লিখেছিলাম এবং 34জন সাহাবীর জীবনচরিত আলোচনা করেছিলাম। এ পর্বে কয়েকজন সাহাবীর জীবনচরিত আলোচনা করেছি যাদের ঘটনাবলী আজীব।

নবী করীম মুহম্মদ (স)-এর কিছু সাহাবী ছিলেন শাহজাদা বা প্রিন্স। যেমন জু-মিখবর (হাবশার প্রিন্স), ওয়ায়েল (হাদরামা্ওতের প্রিন্স) ও ফিরোজ দায়লামী (ইয়েমেনের প্রিন্স)। শাহজাদা বা প্রিন্সরা নবী (স.)-এর খাদেম হয়ে নিজেদেরকে ধন্য মনে করতেন।

আবার কিছু সাহাবী ছিলেন ক্রীতদাস। যেমন বিলাল, জায়েদ বিন হারিছা, আবু রাফে, ছাওবান, কায়েছ ছাফীনা ....

নবী (স)-এর সময়ে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে দাসপ্রথা ছিল। পৃথিবীর কোন দেশে দাসদাসীকে মুক্ত করে সন্তানের মতো লালন করা, দাসীকে মুক্ত করে বিয়ে করা, দাসীর গর্ভজাত সন্তানকে উত্তরাধিকার দেয়া এসবের কোন নজীর পাওয়া যায় না। ইসলাম দাসদের উন্নতির যে সুযোগ দান করেছে, মুক্ত দাস ছাওবান, আবূ রাফে আছলাম, মাবূর কিবতী, জু মিখবর, আবূ বকরা ছাকাফী (রাযিআল্লাহু আনহুম) তার উজ্জল দৃষ্টান্ত।

নবী (স.) জায়েদ বিন হারিছাকে নিজ পুত্রের মতো লালন করেন। নবী (স.) তার ফুফাতো বোনের সাথে মুক্তদাস জায়েদ বিন হারিছা (রা.)-এর বিয়ে দেন। তিনি উম্মে আয়মান বারাকাকে মা বলে ডাকতেন। আবু হুজায়ফা (রা.) সালেম (রা.)-কে নিজ পুত্রের মতো লালন করেন। নবী (স.) জুওয়াইরিয়া, ছাফিয়া, রায়হানাকে দাসীরূপে পেয়ে স্ত্রীরূপে বরণ করেন। তাদেরকে তিনি স্ত্রীরূপে বরণ না করলে ইতিহাসে তাদের নামপরিচয় পাওয়া যেত না। .........।

আবু রাফে দাস ছিলেন, তবে মর্যাদা ও যোগ্যতায় ছিলেন আজাদ লোকদের সমকক্ষ। রসূল (স.) আলী রা)-এর নেতৃত্বে যে বাহিনী ইয়ামেনে পাঠান তাতে আবু রাফেও ছিলেন। আলী (রা.) নিজের অনুপস্থিতিতে আবু রাফেকে বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন। রসুল (স.) এর সাথে আবু রাফের গোলামীর সম্পর্ক এত মধুর ও প্রিয় ছিল যে, আমরণ আবু রাফে রসুল (স.)-এর গোলাম বা দাস বলে নিজের পরিচয় দিতেন।

নবী (স.) বলেন, তোমাদের রব এক, তোমাদের পিতা এক। জেনে রাখ, অনারবের উপরে আরবের কোন প্রাধান্য নেই**,** আরবের উপরেও অনারবের কোন প্রাধান্য নেই। কালোর উপর লালের কোন প্রাধান্য নেই, লালের উপর কালোর কোন প্রাধান্য নেই, তাকওয়া ব্যতীত। (আহমদ)

নবী (স.) বলেন, তোমাদের পিতা আদম আর আদম মাটির তৈয়ারী। (বাযযার)

তোমাদের বিবিদের সাথে সদাচরণ কর, তাদের উপর তোমাদের যেমন হক আছে, তোমাদের উপরও তাদের হক আছে।

দাসদের সাথে সদয় আচরণ কর।

নবী (স.) বলেন, যে দাসীকে আদব শিখায় এবং তাকে আজাদ করে বিয়ে করে তার জন্য দ্বিগুণ পুরষ্কার। (বুখারী) এই হাদীস থেকে বুঝা যায় আজাদ করার আগে দাস দাসীকে আদব শিখাতে হবে।

ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর একটি কালো দাসী ছিল। একবার তিনি গোস্যা হয়ে তাকে চড় দেন। এরপর তিনি ভীত হয়ে রসূল [স.]-এর কাছে আসেন এবং ঘটনাটি বলেন। আল্লাহর রসূল [স.] বলেন, সে কোন ধারণার অনুসারী? তিনি বলেন, সে সওম রাখে, সালাত পড়ে, ওজু করে, এ কথার স্বাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহর রসূল [স.] বলেন, তাহলে সে মুসলিম নারী। তিনি বললেন, আমি তাকে আজাদ করব এবং নিকাহ করব। তিনি তাকে নিকাহ করলে অনেক মুসলিম তাকে দোষারোপ করে। কারণ তারা চাইত, খান্দানী শরাফত বজায় রাখতে শরীফ খান্দানের মুশরিক নারীকে বিয়ে করা। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করেন: অবশ্যই মুসলিম দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে বেহতর, যদিও তাদেরকে তোমার ভালো লাগে। (কুরআন 2:221) [ইবনে কাছীর]

আবূ হিন্দ হাজ্জাম ছিলেন বনু বায়াজার মুক্ত ক্রীতদাস। তিনি হেজামা (শিঙ্গা লাগানো) চিকিৎসা শেখেন, আবূ হিন্দ নবী ()-এর মাথার তালুতে শিংগা লাগান। নবী (স.) বলেনঃ হে বনু বায়াজা! তোমরা আবূ হিনদের মেয়েদের বিবাহ করবে এবং তার সাথে তোমাদের মেয়েদের বিবাহ দিবে। এরপর তিনি বলেন, উত্তমরূপে চিকিৎসার বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিংগা লাগানো। (আবূ দাউদ 2102)

নবী (স)-এর কিছু সাহাবী ছিলেন গোয়েন্দা। যেমন মুহম্মদ বিন মাছলামা ও বুছাইছা।

আগের পর্বে খাদীজা, আয়িশা ও উম্মে সালমা (রা.)-এর এর জীবনী আলোচনা করেছিলাম। এ পর্বে অন্য নবী-পত্নীগণের (সাওদা, হাফছা, জয়নাব বিনতে খুজায়মা, উম্মে হাবীবা, জয়নাব বিনতে জাহাশ, জুওয়াইরিয়্যা, ছাফিয়্যা, মায়নূনা) (রা)-এর জীবনী আলোচনা করেছি।

বইটি লিখতে ও নশর করতে যারা তায়ীদ ও নুসরাত করেছেন তাদের সকলের কাছে ঋণ স্বীকার করছি। মুহতারাম শায়খ জহুরুল হক জায়েদ কিতাবটি প্রকাশ করতে উৎসাহ দিয়েছেন। তার একান্ত আগ্রহে এবং উদ্যোগে আরবি এবারত এবং হাদীস নম্বরসমূহ সংযোজন করা হয়েছে। আল্লাহ তাঁকে পুরস্কার দান করুন দোআ করছি।

শুকরিয়া জানাচ্ছি যারা অনেক ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও পূর্ণ কিতাব/অংশবিশেষ পড়েছেন এবং মূল্যবান সংশোধনী প্রদান করেছেন।

আমরা মূল আরবি কিতাবের নম্বর মাকাতাবাহ শামেলাহ হতে গ্রহন করেছি। যেহেতু বাংলা ভাষায় যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অনুবাদ করেন তখন তাদের মধ্যে নম্বরের তারতম্য পরিলক্ষিত হয় বিধায় অনুবাদ গ্রন্থের নম্বর সংযোজন করা সম্ভব হয় না।

মহান আল্লাহর দেয়া তওফীক দ্বারা এই মুখতাছার জীবনী লেখা হল। আমার বিশ্বাস অনেক ভুল রয়ে গেছে। অনেক বর্ণনার তাহকীক করতে পারি নি। তবুও এ কাজ করলাম যাতে এর উপর ভিত্তি করে আরো ভালো কাজ অন্যরা করতে পারেন। এছাড়া তাহকীক ভুল হতে পারে, রেফারেন্স ভুল হতে পারে, বানান ভুল হতে পারে। পাঠক ভাইবোন ভুল জানতে পারলে ভুল ত্যাগ করে সঠিক বিষয়ের উপর আমল করবেন। আল্লাহ আমাদেরকে সাহাবীগণের জীবন থেকে শিক্ষা নেয়ার তওফীক দান করুন এবং তাদের মত আমাদেরকেও কবুল করুন।

সকল তারীফ আল্লাহর জন্য এবং দরূদ ও সালাম সকল রসূলগণের জন্য।

আব্দুল্লাহ বিন মাছঊদ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাছউদ (রা.) ছিলেন নবী (স)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী। তার জীবনের শুরু মেষচারণ দিয়ে আর জীবনের শেষ কুফাবাসীর শিক্ষক হিছাবে। নবী (স) মক্কায় ইসলাম দাওয়াত দিলে শুরুর দিকের ইসলাম কবুলকারীদের মধ্যে তিনি একজন। ইবনে মাছউদ (রা.) বলেন, আমি উকবা বিন আবু মুআইতের বকরি চরাচ্ছিলাম। রসূল (স.) আবু বকরকে সাথে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, হে বাছা, দুধ আছে কি? আমি বললাম, দুধ আছে, তবে আমি একজন আমানতদার মাত্র। তখন তিনি বললেন, বাচ্চা ছাগীটি আনো। আমি সেটি আনলে তিনি সেটির বাঁট ছুলেন। তখন দুধ নেমে এল। তারপর তিনি ও আবু বকর পেট ভরে পান করলেন। এরপর তিনি আবার বাঁট ছুলেন। ফলে দুধ বন্ধ হয়ে গেল। যাওয়ার সময় তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন; বললেন, হে বাছা, আল্লাহ তোমাকে রহম করুন। (আহমদ 3598)

এ ঘটনার পরপর ইবনে মাছউদ (রা.) ইসলাম কবুল করেন।

জুবাইর বিন আওয়াম (রা.) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাছউদ পহেলা কুরাইশ মুশরিকদেরকে প্রকাশ্যে কুরআন পড়ে শুনান। সাহাবীগণ একদিন একত্রিত হয়ে বললেন, আল্লাহর কছম, কুরাইশরা কখনো প্রকাশ্যে কুরআন শুনেনি। অতএব কে আছে যে তাদেরকে কুরআন শুনাতে পারে? তখন ইবনে মাছউদ বললেন, আমি। এতে সবাই বললেন, আমরা তোমার ব্যাপারে ভয় পাচ্ছি। বরং আমরা এমন একজন লোককে চাচ্ছি যার গোত্র আছে, যারা তাকে রক্ষা করবে। তিনি বললেন, আমাকে ছাড়ুন, আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন। তিনি পরদিন কুরাইশদের ভরা মজলিসে এসে দাড়ান। তারপর উচু আওয়াজে সূরা রহমান পড়তে থাকেন। তারা বলল, দাসের মায়ের বেটা কী বলছে? কেউ বলল, মুহম্মদ যা এনেছে তার কিছু পড়ছে। তখন সবাই তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং তার মুখে মারতে শুরু করল। এভাবে মার খেয়ে তিনি তার সাথীদের কাছে ফিরে এলেন। তারা বললেন, তোমার ব্যাপারে আমরা এটাই ভয় করেছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর দুশমনরা আমার কাছে সহজ হয়ে গেছে। যদি আপনারা চান, কাল সকালে আবার আমি তাদের কাছে যাব এবং কুরআন শুনাব। তারা বললেন, না, যথেষ্ট হয়েছে। তারা যা পছন্দ করে না তুমি তাদেরকে তাই শুনিয়েছ। (ইবনে হিশাম, আছার সহীহ)

৬৬২ সালে তিনি কুফার কাজী হিছাবে নিযুক্ত হন।

ইবনে মাছউদ বহুসংখ্যক হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন|

ইবনে মাছউদ (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, যখন নবী (স.)-কে রাতের সফর করানো হয় (অর্থাৎ মিরাজের রাতে) তখন তিনি সপ্তম আসমানের সীমানায় ‘সিদরাতুল মুনতাহা’ পর্যন্ত পৌঁছেন। তাকে তিনটি জিনিস দেয়া হয় - পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, সূরা বাকারার শেষ অংশ এবং তার উম্মতের যারা শির্ক করেনি তাদের মাফের খোশখবর। (সহীহ মুসলিম, আরও আহমদ, তিরমিযী)

ইবনে মাছউদ (রা) রেওয়ায়েত করেছেন, নবী (স.) বলেন, “তোমাদের জন্য সত্যবাদিতা জরূরী। কারণ সত্যবাদিতা সৎকাজের দিকে নিয়ে যায় আর সৎকাজ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।” (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

ইবন মাছঊদ (রা.) রেওয়ায়েত করেন, রসুলুল্লাহ (ছ.) বলেছেনঃ যে কুরআনের একটি হরফ পাঠ করবে তার নেকী হবে। আর নেকী হয় দশ গুণ হিসাবে। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হয়ফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, এবং মীম আরেকটি হরফ। (তিরমিজী 2910)

ইবনে মাছউদ (রা:) বলেন, নবী (স.) আমাকে তাশাহহুদ শিখিয়েছেনঃ “আততাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসলাওয়াতু ওয়াততায়্যিবাতু; আস সালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু, ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আস সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সলিহীন, আশহাদু আল লা ইলাহা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহ। (বুখারী, মুসলিম)

ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, সা’দ ইবনু মুআজ (রাঃ) ওমরা আদায় করার জন্য (মক্কা) গমন করলেন এবং সাফওয়ানের পিতা উমাইয়া ইবনু খালাফ এর বাড়িতে তিনি অতিথি হলেন। উমাইয়াও সিরিয়ায় গমনকালে (মদিনায়) সা’দ (রাঃ) এর বাড়িতে অবস্থান করত। উমাইয়া সা’দ (রাঃ) কে বলল, অপেক্ষা করুন, যখন দুপুর হবে এবং যখন চলাফেরা কমে যাবে, তখন আপনি যেয়ে তাওয়াফ করে নিবেন। (অবসর মুহূর্তে) সা’দ (রাঃ) তাওয়াফ করছিলেন। এমতাবস্থায় আবূ জেহেল এসে হাজির হল। সা’দ (রাঃ) কে দেখে জিজ্ঞাসা করল, এ ব্যাক্তি কে? যে কাবার তাওয়াফ করছে? সা’দ (রাঃ) বললেন, আমি সা’দ। আবূ জেহেল বলল, তুমি নির্বিঘ্নে কাবার তাওয়াফ করছ? অথচ তোমরাই মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীদেরকে আশ্রয় দিয়েছে? সা’দ (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। এভাবে দু’জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। তখন উমাইয়া সা’দ (রা.) কে বলল, আবূল হাকামের সাথে উচ্চস্বরে কথা বল না, কেননা সে মক্কাবাসীদের (সর্বজন মান্য) নেতা। এরপর সা’দ (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি যদি আমাকে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে বাঁধা প্রদান কর, তবে আমিও তোমার সিরিয়ার সাথে ব্যবসা বানিজ্যের রাস্তা বন্ধ করে দিব। (বুখারী)

একদিন আবু মূসা (রা.) ইবনে মাছউদ (রা.)-কে বললেন, আমি মসজিদে কিছু কাজ দেখলাম যা আমার কাছে অপরিচিত। আমার কাছে ভালো মনে হয়েছে। আমি দেখলাম কিছু লোক গোল হয়ে বসে সালাতের আগে অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক হালাকায় একজন করে লোক আছে; আর তাদের কাছে আছে গণনার পাথর, সে বলছে একশত বার তাকবীর বল, তারা তাকবীর বলছে। সে বলছে একশত বার তাহলীল বল, তারা তাহলীল বলছে। তারা সে বলছে একশত বার তাসবীহ বল, তারা তাসবীহ বলছে। ইবনে মাছউদ বললেন, আপনি তাদেরকে কী বলেছেন? আবু মূসা বললেন, আমি তাদেরকে কিছু বলি নি। আমি আপনার রায় এবং আপনার নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছি। ইবনে মাছউদ মসজিদে এসে কাজ একটি হালকার কাছে গেলেন; বললেন, এটা কী উদ্ভাবন করেছ যা আমি তোমাদেরকে করতে দেখছি? তারা বলল, হে আব্দুর রহমানের বাবা, আমরা তাকবীর, তাহলীল ও তাসবীহ গণনা করছি। ইবনে মাছউদ বললেন, তোমরা তোমাদের গুনাহ গণনা করে রাখ। আমি যিম্মাদার যেন তোমরা সৎকাজ নষ্ট না কর। হে মুহম্মদ স.-এর উম্মত, তোমরা এত শীগগির হালাক হলে, যখন তোমাদের মধ্যে তোমাদের নবীর এই সাহাবীগণ আছেন? তার কাপড় এখনও জীর্ণ হয়নি। তার প্লেট এখনও ভাঙ্গে নি। তোমরা কি নবী [স.]-এর মিল্লাতের চেয়ে ভালো মিল্লাত পেয়েছ না কি গোমরাহীর দরজা খুলেছ? তারা বলল, আমরা ভালো মনে করেই একাজ করেছি। ইবনে মাছউদ বললেন, কল্যাণের আশাবাদী কত লোক কল্যাণ পায় না। নবী স. বলেছেন, একটি কওম কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের গলার নীচে নামবে না। (দারেমী)

ইবনুল জাওযী বলেছেন আবুল বুখতারী থেকে যথাযথ সনদে জানা গেছে, ইবনে মাছউদ (রা.)-কে একজন খবর দিলেন, মসজিদে মাগরিব সালাতের পর একদল লোক বসা আছে। তাদের একজন বলছে এত বার তাকবীর বল, তারা তাকবীর বলছে। সে বলছে এত বার তাসবীহ বল, তারা তাসবীহ বলছে। সে বলছে এত বার তাহমীদ বল, তারা তাহমীদ বলছে। ইবনে মাছউদ বললেন, যখন তাদেরকে এটা করতে দেখবে তখন আমাকে খবর দিও। তিনি তাদের কাছে এলেন ও বসলেন। যখন তারা যা বলত তা বলতে লাগল, ইবনে মাছউদ বললেন, আমি ইবনে মাছউদ, যে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই তার শপথ, তোমরা অবশ্যই বিদআত ও জুলুম করছ। নতুবা তোমরা মুহম্মদ (স.)-এর সাহাবীদের চেয়েও বেশি এলেম রাখ! (তালবীছু ইবলীস)

ইবন মাসউদের বিবি জয়নাব রেওয়ায়েত করেন, ইবন মাসউদ বলেন: “আমি রসূল (স.) কে বলতে শুনেছি যে ঝাড়ফুঁক, তাবিজ ও কবচ হচ্ছে শিরক।” আমি বললাম, ‘আপনি কেন একথা বললেন? আল্লাহর কসম, আমার চোখ দিয়ে অসুখের কারণে পানি ঝরছিল এবং আমি অমুক ইহুদীর কাছে গিয়েছিলাম, সে ঝাড়ফুঁক করতেই পানি পড়া বন্ধ হয়ে গেল।’ ইবন মাসউদ বললেন, ‘এটা শয়তানের কারসাজি ছিল, সে তার হাত দিয়ে তোমার চোখে খোঁচা দিচ্ছিল, ইহুদীটি মন্ত্র উচ্চারণ করতেই সে থেমে গেল। কারণ যখন তুমি তাকে মেনে নিচ্ছিলে সে থেমে যাচ্ছিল আর যখন তুমি তার অনুগত হচ্ছিলে না তখন সে খোঁচা দিচ্ছিল। তোমার যা বলা উচিত ছিল তা হচ্ছে এই দুআ: ইযহাবিল বা’ছ, রাব্বান নাস, ওয়াশফি, আনতাশ শাফি’, লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা, শিফা’আল লা ইউগাদিরু সাকামান।’ [অর্থ: মন্দ দূর কর, হে মানবজাতির রব, এবং সুস্থতা দাও, তুমিই আরোগ্যদাতা। তোমার আরোগ্য ছাড়া কোন আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য যা রোগের কোন চিহ্ন রাখে না।] (আবু দাউদ ৩৮৮৩; ইবন মাজাহ ৩৫৩০)

ইবনে মাছউদ (রা:) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ (স.)-এর সালাত আদায় করে দেখাব না? তখন তিনি সালাত আদায় করেন। তিনি সালাতের মধ্যে শুধু পহেলা বার ছাড়া তাঁর দুই হাত উঠালেন না। (নাছায়ী ১০২৬, আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ২৫৭। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, ইবনে হাজম সহীহ বলেছেন।)

তোমরা কি নবী [স.]-এর মিল্লাতের চেয়ে ভালো মিল্লাত পেয়েছ না কি গোমরাহীর দরজা খুলেছ?

তাবিজ ও কবচ হচ্ছে শিরক।

ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ ()-এর সাথে সলাত আদায় করলাম। এ সলাতে তিনি কিরআত এত দীর্ঘ করলেন যে, আমি একটি মন্দ ইচ্ছা করেছিলাম। আবূ ওয়ায়িল বলেছেন তাকে (ইবনু মাসউদকে) জিজ্ঞেস করা হ’ল, আপনি কী ধরনের মন্দ ইচ্ছা করেছিলেন? জবাবে তিনি বললেনঃ আমি বসে পড়ার এবং তার পিছনে এ সলাত পরিত্যাগ করার ইচ্ছা করেছিলাম। (Muslim 1850)

**জাফর ইবন আবী তালিব (রা)**

জাফর রসূল (স.)-এর চাচাত ভাই এবং আলী (রা.)-এর সহোদর। বয়সে আলী (রা.) থেকে দশ বছর বড়। বনী আবদে মান্নাফের পাঁচ ব্যক্তির চেহারা রসূল (স.)-এর চেহারার সাথে এত বেশী মিল ছিল যে প্রায়শঃ ক্ষীণ দৃষ্টির লোকেরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলত। সে পাঁচ ব্যক্তি হলেনঃ ১. আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস ইবন আবদিল মুত্তালিব (তিনি রসূল (স.)-এর চাচাতো ভাই এবং দুধ ভাইও), ২. কুসাম ইবনুল আব্বাস ইবন মুত্তালিব (তিনিও রসূল স.র চাচাতো ভাই), ৩. সায়িব ইবন উবায়িদ ইবন আবদে ইয়াযিদ ইবন হাশিম (ইমাম শাফেয়ীর রহ. পিতামহ), ৪. হাসান ইবন আলী (রসূল স.-এর দৌহিত্র; রসূল (স.)-এর চেহারার সাথে তাঁর চেহারার সাদৃশ্য ছিল সর্বাধিক), ৫ম ব্যক্তি জাফর ইবন আবী তালিব।

কুরাইশদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অধিক সন্তান-সন্ততি ও পোষ্যের কারণে আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা ছিল দারুণ অসচ্ছল। অনাবৃষ্টির বছরটি তাঁর অসচ্ছল অবস্থাকে আরও নিদারুণ করে তোলে। সেই মারাত্মক খরার বছরে কুরাইশদের সব ফসল পুড়ে যায়, গবাদি পশুও ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে একটা হাহাকার পড়ে যায়। এ সময় বনী হাশিমের মধ্যে মুহাম্মদ বিন আবদিল্লাহ এবং তাঁর চাচা আব্বাস অপেক্ষা অধিকতর সচ্ছল ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না।

একদিন মুহম্মাদ (স.) চাচা আব্বাসকে বললেনঃ ‘চাচা, আপনার ভাই আবু তালিবের তো অনেক সন্তানাদি। মানুষ এ সময় দারুণ দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্টের মধ্যে আছে। চলুন না আমরা তাঁর কাছে যাই এবং তাঁর কিছু সন্তানের বোঝা আমাদের কাঁধে তুলে নেই। তাঁর একটি ছেলেকে আমি নেব এবং অপর একটিকে আপনি নেবেন।’

আব্বাস মন্তব্য করলেনঃ তুমি সত্যিই একটি কল্যাণের দিকে আহ্বান জানিয়েছ এবং একটি ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছ।’

এরপর তাঁরা দু’জন আবু তালিবের কাছে গেলেন। বললেন, ‘আমরা এসেছি আপনার পরিবারের কিছু বোঝা লাঘব করতে, যাতে মানুষ যে দুর্ভিক্ষে নিপতিত হয়েছে তা থেকে আপনি কিছুটা মুক্তি পান।’

আবু তালিব বললেন, ‘আমার জন্য আকীলকে (আকীল ইবন আবী তালিব) রেখে তোমরা যা খুশী তাই করতে পার।’ অতঃপর মুহাম্মাদ সা. নিলেন আলীকে এবং আব্বাস জাফরকে।

আলী প্রতিপালিত হতে লাগলেন মুহাম্মাদের সা. তত্ত্বাবধানে। এরপর আল্লাহ মুহাম্মাদ স. কে নুবুওয়াত দান করেন এবং যুবকদের মধ্যে আলীই তাঁর ওপর প্রথম ঈমান আনার সৌভাগ্য অর্জন করেন। অন্যদিকে জাফর তাঁর চাচা আব্বাসের কাছে প্রতিপালিত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে স্বনির্ভর হন।

জাফর ও তাঁর বিবি আসমা বিনতু উমাইস সিদ্দীকে আকবরের হাতে রসূল (স.)-এর ‘দারুল আরকামে’ প্রবেশের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। ???? একদিন আবু তালিব দেখতে পেলেন, রসূল (স.)-এর পাশে দাঁড়িয়ে আলী সালাত পড়ছেন। এ দৃশ্য আবু তালিবের খুবই ভালো লাগলো। পাশেই দাঁড়ানো জাফরের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেনঃ জাফর, তুমিও তোমার চাচাতো ভাই মুহাম্মাদের সা. একপাশে দাঁড়িয়ে যাও। জাফর রসূল (স.)-এর বাম দিকে দাঁড়িয়ে সেদিন সালাত আদায় করেন। এ ঘটনা জাফরের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এর অল্পকিছু দিনের মধ্যেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বে মাত্র ৩১/৩২ জন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

প্রথম যুগের মুসলিমরা যেসব দৈহিক ও মানসিক কষ্ট ভোগ করেছিল তার সবই এ হাশেমী যুবক ও তাঁর স্ত্রী ভোগ করেছিলেন। কিন্তু কখনও তাঁরা ধৈর্যহারা হননি। ইসলামী অনুশাসনগুলি পালনে এবং এক আল্লাহর ইবাদাতে কুরাইশরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কুরাইশরা তাঁদের জন্য ওঁৎ পেতে থেকে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ গড়ে তুলত।

এমনি এক মুহূর্তে জাফর, তাঁর স্ত্রী এবং আরও কিছু সাহাবী রসূল (স.)-এর কাছে হাবশায় হিজরাতের অনুমতি চাইলেন। তিনি তাদের অনুমতি দিলেন।

মুসলিমদের এ দলটির হাবশায় হিজরত এবং সেখানে বাদশার দরবারে আশ্রয় ও নিরাপত্তা লাভের ব্যাপারে কুরাইশরা জানে। তারা তাদেরকে হত্যা অথবা ফিরিয়ে আনার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করল। উম্মে সালামা রা. বলেনঃ ‘আমরা যখন হাবশায় পৌঁছলাম, সেখানে সৎ প্রতিবেশী এবং আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলাম। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদাতের ব্যাপারে আমরা কোন প্রকার অত্যাচারের সম্মুখীন হলাম না অথবা আমাদের অপছন্দনীয় কোন কথাও আমরা শুনলাম না। এ কথা কুরাইশরা জানতে পেরে ষড়যন্ত্র শুরু করল। তারা তাদের মধ্য থেকে শক্তিমান ও তাগড়া জোয়ান দু’ব্যক্তিকে নির্বাচন করে নাজ্জাশীর কাছে পাঠাল। এ দুজন হল, আমর ইবনুল আছ ও বুহায়রা ইবন আবী রাবীয়া। তারা তাদের দুজনের সংগে নাজ্জাশী ও তার দরবারের চাটুকার পাদ্রীদের জন্য প্রচুর মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাল। তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছিল, হাবশার রাজার সাথে আমাদের বিষয়টি আলোচনার পূর্বেই প্রত্যেক পাদ্রীর জন্য নির্ধারিত হাদিয়া তাদের পৌঁছে দেবে।

তারা দু’জন হাবশা পৌঁছে নাজ্জাশীর পাদ্রীদের সাথে মিলিত হল এবং তাদের প্রত্যেককে তার জন্য নির্ধারিত উপঢৌকন পৌছে দিয়ে বলল, ‘‘বাদশাহর সাম্রাজ্যে আমাদের কিছু বিভ্রান্ত সন্তান আশ্রয় নিয়েছে। তারা তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করেছে। আমরা যখন তাদের সম্পর্কে বাদশাহর সংগে কথা বলবো, আপনারা তাদের দ্বীন সম্পর্কে কোন রকম জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই তাদেরকে আমাদের কাছে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে বাদশাহকে একটু অনুরোধ করবেন। কারণ, তাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দই তাদের বিশ্বাস ও আচরণ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তারাই তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন।’’

দরবারী পাদ্রীরা তাদের কথায় সায় দিল।

উম্মে সালামা বলেন, ‘বাদশাহ আমাদের কাউকে ডেকে তার কথা শুনুক, এর চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছু আমর ইবনুল আস ও তার সংগীর কাছে ছিলনা।’

তারা দু’জন নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে উপঢৌকন পেশ করল। এরপর তারা বাদশাহকে বললঃ ‘‘মহামান্য বাদশাহ, আমাদের কিছু দুষ্টু প্রকৃতির ছেলে আপনার সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছে। তারা এমন একটি ধর্ম আবিষ্কার করেছে যা আমরাও জানিনে এবং আপনিও জানেন না। তারা আমাদের দীন পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু আপনাদের দীনও গ্রহণ করেনি। তাদের পিতা, পিতৃব্য ও গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তাদের সৃষ্ট অশান্তি ও বিপর্যয় সম্পর্কে তাদের গোত্রীয় নেতারাই অধিক জ্ঞাত।’’

নাজ্জাশী তাঁর দরবারে উপস্থিত পাদ্রীদের দিকে তাকালেন। তারা বললঃ ‘মহামান্য বাদশাহ, তারা সত্য কথাই বলেছে। কারণ তাদের গোত্রীয় নেতারাই তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। গোত্রীয় নেতাদের কাছে আপনি তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিন, যাতে গোত্রীয় নেতারা তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।’

পাদ্রীদের কথায় বাদশাহ দারুণ ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন, ‘‘আল্লাহর কসম! তা হতে পারেনা। তাদের প্রতি যে অভিযোগ আরোপ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ না করা পর্যন্ত একজনকেও আমি সমর্পণ করব না। সত্যিই তারা যদি এমনই হয় যেমন এ দু’ব্যক্তি বলছে, তাহলে তাদেরকে সমর্পণ করব। তা না হলে তারা যতদিন আমার আশ্রয়ে থাকতে চায়, আমি তাদেরকে নিরাপত্তার সাথে থাকতে দেব।’’

উম্মে সালামা বলেনঃ ‘‘এরপর নাজ্জাশী আমাদেরকে ডেকে পাঠালেন তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য। যাওয়ার আগে আমরা সকলে একস্থানে সমবেত হলাম। আমরা অনুমান করলাম, নিশ্চয় বাদশাহ আমাদের কাছে আমাদের দীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, যা আমরা বিশ্বাস করি তা প্রকাশ করে দেব। আর সবার পক্ষ থেকে জাফর ইবন আবী তালিব কথা বলবেন। অন্য কেউ কোন কথা বলবে না।’’

উম্মে সালামা বলেনঃ এরপর নাজ্জাশীর কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম, তিনি তাঁর সকল পাদ্রীদের ডেকেছেন। তারা তাদের বিশেষ অভিজাত পোশাক পরে সাথে ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ মেলে ধরে বাদশাহর ডান ও বাম দিকে বসে আছে। আমর ইবনুল আস ও বুহায়রা ইবন আবী রাবীয়াকেও আমরা বাদশাহর কাছে দেখতে পেলাম। মজলিসে আমরা স্থির হয়ে বসার পর, নাজ্জাশী আমাদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ ‘সে কোন্ ধর্মমত- যা তোমরা নতুন আবিষ্কার করেছ এবং যার কারণে তোমরা তোমাদের খান্দানী ধর্মকেও পরিত্যাগ করেছ, অথচ আমার অথবা অন্যকোন ধর্মও গ্রহণ করনি?’

জাফর ইবন আবী তালিব সবার পক্ষ থেকে বললেনঃ ‘‘মহামান্য বাদশাহ! আমরা ছিলাম একটি মূর্খ জাতি। মূর্তির উপাসনা করতাম, মৃত জন্তু ভক্ষণ করতাম, অশ্লীল কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলাম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম, এবং প্রতিবেশীর সাথে অসদ্ব্যবহার করতাম। আমাদের সবলরা দুর্বলদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করত। আমরা ছিলাম এমনি এক অবস্থায়। অবশেষে আল্লাহ আমাদের কাছে একজন রসূল পাঠালেন। আমরা তাঁর বংশ, সততা, আমানতদারী, পবিত্রতা ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানালেন, যেন আমরা তার একত্বে বিশ্বাস করি, তাঁর ইবাদত করি এবং আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা যেসব গাছ, পাথর ও মূর্তির পূজা করতাম তা পরিত্যাগ করি।

তিনি আমাদের নির্দেশ দিলেন সত্য বলার, গচ্ছিত সম্পদ যথাযথ প্রত্যর্পণের, আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখার, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করার, হারাম কাজ ও অবৈধ রক্তপাত থেকে বিরত থাকার। তাছাড়া অশ্লীল কাজ, মিথ্যা বলা, ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ ও নিষ্কলূষ চরিত্রের নারীর প্রতি অপবাদ দেয়া থেকে নিষেধ করলেন।

তিনি আমাদের আরও আদেশ করেছেন এক আল্লাহর ইবাদত করার, তাঁর সাথে অন্য কিছু শরীক না করার, সালাত কায়েম করার, যাকাত দানের এবং রমযান মাসে রোযা রাখার।

আমরা তাঁকে সত্যবাদী জেনে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আল্লাহর কাছ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার অনুসরণ করেছি। সুতরাং যা তিনি আমাদের জন্য হালাল এবং হারাম ঘোষণা করেছেন, আমরা তা হালাল ও হারাম বলে বিশ্বাস করেছি।

মহামান্য বাদশাহ! এরপর আমাদের জাতির সকলেই আমাদের ওপর বাড়াবাড়ি আরম্ভ করল। তারা আমাদের দ্বীন থেকে পুনরায় মূর্তিপূজার দিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য আমাদের ওপর অত্যাচার চালাল। তারা যখন আমাদেরকে অত্যাচার উৎপীড়নে জর্জরিত করে তুলল এবং আমাদের ও আমাদের দ্বীনের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল, তখন আমরা অন্য কোথাও না গিয়ে আপনার এখানেই আসাকেই প্রাধান্য দিলাম এই আশায় যে, আপনার এখানে আমরা অত্যাচারিত হব না।’’

উম্মে সালামা বলেনঃ এরপর নাজ্জাশী জাফর ইবন আবী তালিবের দিকে তাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের নবী আল্লাহর কাছে থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার কিছু অংশ কি তোমাদের সংগে আছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। ‘আমাকে একটু পাঠ করে শুনাও।’ জাফর পাঠ করলেনঃ ‘‘কাফ্-হা-ইয়া-আইন-সাদ। এ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা জাকারিয়ার প্রতি। যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিল গোপনে। সে বলেছিল, ‘আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মাথা সাদা হয়েছে; হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করে আমি কখনও ব্যর্থকাম হইনি।’’..... এভাবে তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা মরিয়মের প্রথম অংশ পাঠ করে শুনালেন।

আল্লাহর কালাম শুনে নাজ্জাশী এত কাঁদলেন যে অশ্রুধারায় তার দাড়ি ভিজে গেল এবং দরবারে উপস্থিত পাদ্রীরা কেঁদে তাদের সম্মুখে উন্মুক্ত ধর্মগ্রন্থসমূহ ভিজিয়ে দিল। কিছুটা শান্ত হয়ে নাজ্জাশী বললেনঃ ‘তোমাদের নবী যা নিয়ে এসেছেন এবং তাঁর পূর্বে ঈসা আ. যা নিয়ে এসেছিলেন উভয়ের উৎস এক। এরপর আমর ও তার সংগীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা চলে যাও। আল্লাহর কসম! তোমাদের হাতে আমি তাদেরকে সমর্পণ করব না।’

উম্মে সালামা বলেনঃ আমরা নাজ্জাশীর দরবার থেকে বেরিয়ে এলে আমর ইবনুল আছ আমাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে তার সংগীকে বলল, ‘আল্লাহর কসম! আগামীকাল আবার আমরা বাদশাহর কাছে আসব এবং তাঁর নিকটে তাদের এমন সব কার্যকলাপ তুলে ধরব যাতে তাঁর হৃদয়ে হিংসার আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে এবং তাদের প্রতি ঘৃণায় তাঁর অন্তর পূর্ণ হয়ে যায়। তাদেরকে সম্পূর্ণ উৎখাত করার জন্য আমরা অবশ্যই বাদশাহকে উৎসাহিত করব।’ একথা শুনে তার সংগী বুহায়রা ইবন আবী রাবীয়া বললঃ ‘আমর, এমনটি করা উচিত হবে না। ধর্মীয় ব্যাপারে আমাদের বিরোধিতা করলেও তারা তো আমাদের আত্মীয়।’

আমর বললঃ ‘তুমি রাখ তো এসব কথা। আমি অবশ্যই বাদশাহকে এমন সব কথা অবহিত করব যা তাদের অন্তরকে কাঁপিয়ে তুলবে। বাদশাহকে আমি বলবঃ তারা মনে করে ঈসা ইবন মরিয়ম অন্যদের মতই একজন বান্দা।’

পরদিন সত্যি সত্যিই আমর নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললঃ ‘মহামান্য বাদশাহ! এসব লোক, যাদেরকে আপনি আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করছেন, তারা ঈসা ইবন মরিয়ম সম্পর্কে একটা মারাত্মক কথা বলে থাকে। আপনি তাদের কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখুন তারা তাঁর সম্পর্কে কি বলে।’

উম্মে সালাম বলেনঃ আমরা একথা জানতে পেয়ে ভীষণ দুঃশ্চিন্তায় পড়লাম। আমরা পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞেস করলামঃ ‘বাদশাহ যখন ঈসা ইবন মরিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা তখন কি বলবে? ‘সবাই ঐকমত্যে পৌছলাম; তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ যা বলেছেন তার অতিরিক্ত আর কিছুই আমরা বলব না। আমাদের নবী তাঁর সম্পর্কে যা কিছু এনেছেন তা থেকে আমরা এক আংগুলের ডগা পরিমাণও বাড়িয়ে বলবনা। তাতে আমাদের ভাগ্যে যা থাকে তা-ই হবে। আমাদের পক্ষ থেকে এবারও জাফর ইবন আবী তালিব কথা বলবেন।

নাজ্জাশী আমাদের ডেকে পাঠালেন। আমরা তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম, পাদ্রীরা পূর্বের দিনের মত একই বেশভূষায় বসে আছে। আমর ইবনুল আস তার সংগী সেখানে উপস্থিত হতেই বাদশাহ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ‘ঈসা ইবন মরিয়ম সম্পর্কে তোমরা কি বলে থাক?’

জাফর ইবন আবী তালিব বললেনঃ ‘আমাদের নবী তাঁর সম্পর্কে যা বলেন তার অতিরিক্ত আমরা কিছুই বলিনে।’

‘তিনি কি বলে থাকেন?’

‘তিনি বলেনঃ তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি তার রূহ ও কালাম- যা তিনি কুমারী ও পবিত্র মরিয়মের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন।’জাফরের কথা শুনে নাজ্জাশী হাত দ্বারা মাটিতে আঘাত করতে করতে বললেনঃ ‘আল্লাহর কসম! ঈসা ইবন মরিয়ম সম্পর্কে তোমাদের নবী যা বলেছেন তা একটি লোম পরিমাণও অতিরঞ্জন নয়।’ একথা শুনে নাজ্জাশীর আশেপাশে উপবিষ্ট পেট্রিয়ার্করা তাদের নাসিকাছিদ্র দিয়ে ঘৃণাসূচক শব্দ বের করল। বাদশাহ বললেনঃ ‘তা তোমরা যতই ঘৃণা কর না কেন।’ তারপর তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ যাও, তোমরা স্বাধীন ও নিরাপদ। কেউ তোমাদের গালি দিলে বা কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তার বদলা নেওয়া হবে। আল্লাহর কসম! আমি সোনার পাহাড় লাভ করি, আর তার বিনিময়ে তোমাদের কারও ওপর সামান্য বিপদ আপতিত হোক- এটাও আমার পছন্দনীয় নয়। এরপর তিনি আমর ও তার সংগীর দিকে ফিরে বললেনঃ ‘এ দুজনের উপঢৌকন তাদেরকে ফেরত দাও। আমার সেগুলি প্রয়োজন নেই।’

উম্মে সালামা বলেনঃ এভাবে আমর ও তাঁর সংগীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল এবং তারা ভগ্ন হৃদয়ে পরাজিত ও হতাশ অবস্থায় দরবার থেকে বেয়ে গেল। আর আমরা উত্তম বাসগৃহে সম্মানিত প্রতিবেশীর মত নাজ্জাশীর কাছে বাস করতে লাগলাম। (......... )

এরপর জাফর পূর্ণ দশটি বছর অতিবাহিত করেন। সপ্তম হিজরীতে তাঁরা দু’জন এবং আরও কিছু মুসলিম হাবশা থেকে ইয়াসরিবের (মদীনা) দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁরাও মদীনায় পৌঁছলেন, আর এদিকে রসূল স. খাইবার বিজয় শেষ করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। রসূল স. জাফরকে দেখে এত খুশী হলেন যে, তাঁর দু’চোখের মাঝখানে চুমু দিযে বললেনঃ ‘আমি জানিনে, খাইবার বিজয় আর জাফরের আগমণ- দু’টির কোন্টির কারণে আমি বেশী খুশী।’

সাধারণভাবে সমগ্র মুসলিম সমাজ এবং বিশেষভাবে গরীব মুসলিমদের আনন্দ ও খুশী জাফরের আগমণে রসূল (স.)-এর থেকে বিন্দুমাত্র কম ছিল না। কারণ জাফর ছিলেন গরীব-মিসকীনদের প্রতি ভীষণ দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। এ কারণে তাঁকে ডাকা হত আবূল মাসাকীন বা মিসকীনদের পিতা বলে।

জাফবের মদীনায় আসার পর একটি বছর কেটে গেল। অষ্টম হিজরীর প্রথম দিকে সিরিয়ার রোমান বাহিনীকে আক্রমণের জন্য রসূল স. সেনাবাহিনী প্রস্তুত করলেন। জায়িদ বিন হারিসাকে সেনাপতি নিয়োগ করে তিনি বললেনঃ ‘জায়িদ নিহত হলে আমীর হবে জাফর ইবন আবী তালিব। জাফর নিহত বা আহত হলে আমীর হবে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। আর সে নিহত বা আহত হলে মুসলিমরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্বাচন করবে।’

মুসলিম বাহিনী জর্দানের সিরিয়া সীমান্তের মূতা নামক স্থানে পৌঁছে দেখতে পেল, এক লাখ রোমান সৈন্য তাদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত এবং তাদের সাহায্যের জন্য লাখম, জুজাম, কুদাআ ইত্যাদি আরব গোত্রের আরও এক লাখ খৃষ্টান সৈন্য পেছনে প্রতীক্ষা করছে। অন্যদিকে মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা মাত্র তিন হাজার। যুদ্ধ শুরু হতেই জায়িদ বিন হারিসা শাহাদত বরণ করেন। এরপর জাফর বিন আবী তালিব তাঁর ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়েন এবং শত্রু বাহিনী যাতে সেটি ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য নিজের তরবারী দ্বারা ঘোড়াটিকে হত্যা করে ফেলেন। তারপর পতাকাটি তুলে ধরেন রোমান বাহিনীর অভ্যন্তরভাগে বহু দূর পর্যন্ত প্রবেশ করে শত্রু নিধনকার্য চালাতে থাকেন। এমতাবস্থায় তাঁর ডান হাতটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। তিনি বাম হাতে পতাকা উঁচু করে ধরেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তরবারির অন্য একটি আঘাতে তাঁর বাম হাতটিও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবুও তিনি হাল ছাড়লেন না। বাহু দিয়ে বুকের সাথে জাপ্টে ধরে তিনি ইসলামী পতাকা সমুন্নত রাখলেন। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ পর তরবারির তৃতীয় একটি আঘাত তাঁর দেহটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।

এরপর পতাকাটি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা তুলে নিলেন। শত্রু সৈন্যের সাথে বীর বিক্রমে লড়তে লড়তে তিনিও তাঁর দুই সাথীর অনুগামী হলেন। তারপর খালিদ বিন ওয়ালিদ পতাকা হাতে নিয়ে মুসলিম বাহিনীকে উদ্ধার করেন।

এ যুদ্ধে ইবন উমারও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেনঃ জাফরের লাশ তালাশ করে দেখা গেল, শুধু তাঁর সামনের দিকেই পঞ্চাশটি ক্ষতচিহ্ন। সারা দেহে তাঁর নব্বইটিরও বেশী ক্ষত ছিল। কিন্তু তার একটিও পেছন দিকে ছিল না।

এ তিন সেনাপতির শাহাদাতের খবর শুনে রসূল স. দারুণভাবে ব্যথিত হন। বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি তাঁর চাচাত ভাই জাফরের বাড়ীতে যান। তখন তাঁর স্ত্রী আসমা স্বামীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

আসমা বলেনঃ পাতলা ও পরিষ্কার একখানা কাপড় দিয়ে পবিত্র মুখমণ্ডল ঢেকে রসূল স.-কে আমাদের বাড়ীর দিকে আসতে দেখে আমার মনে নানারকম ভীতি ও শঙ্কার উদয় হল। কিন্তু খারাপ কিছু শুনতে হয় এ ভয়ে আমি তাঁকে জাফর সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছিলাম না। কুশলাদি জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেনঃ ‘জাফরের ছেলেমেয়েদের আমার কাছে নিয়ে এস।’ আমি তাদেরকে ডাকলাম। তারা খুশিতে বাগবাগ হয়ে কে আগে রসূল স.)-এর কাছে পৌঁছবে এরূপ একটা প্রতিযোগিতা নিয়ে দৌড় দিল। রসূল সা. তাদেরকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিতে লাগলেন। তখন তাঁর দু’চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। আমি বললামঃ ‘হে রসূলাল্লাহ! আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান হোক। আপনি কাঁদছেন কেন?’ জাফর ও তার সংগী দু’জনের কোন দুঃসংবাদ পেয়েছেন কি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আজই তারা শাহাদত বরণ করেছেন। আর সেই মুহূর্তে ছোট্ট ছেলে-মেয়েদের মুখের হাসি বিলীন হয়ে গেল। যখন তারা শুনতে পেল তাদের মা কান্না ও বিলাপ করছে, তারা নিজ নিজ স্থানে পাথরের মত এমন স্থির হয়ে গেল, যেন তাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। প্রতিবেশী মহিলারা এসে আসমার পাশে ভিড় করল। রসূল সা. চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেলেন। বাড়ীতে পৌঁছে আযওয়াজে মুতাহ্হারাতকে বললেনঃ ‘আজ তোমরা জাফরের পরিবারবর্গের প্রতি একটু নজর রেখ। তারা আজ চেতনাহীন।’

জাফরের শাহাদতের পর দীর্ঘদিন ধরে রসূল (স.) শোকার্ত ও বিমর্ষ ছিলেন। অবশেষে জিবরীল আ. তাঁকে সুসংবাদ দান করেন যে, আল্লাহ জাফরকে তাঁর দুটি কর্তিত হাতের পরিবর্তে নতুন দু’টি রক্তরাঙা হাত দান করেছেন এবং তিনি জান্নাতে ফিরিশতাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছেন। এ কারণে তাঁর উপাধি হয়, ‘যুল-জানাহাইন’ ও ‘তাইয়ার’- দু’ ডানাওয়ালা ও উড়ন্ত।

ইবন সাদ তাঁর তাবাকাতে বর্ণনা করেনঃ জায়িদ বিন হারিসা, জাফর ইবন আবী তালিব ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার শাহাদতের খবর শুনে রসূলুল্লাহ স. উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে তাদের পরিচয় তুলে ধরে প্রশংসা করে এক সংক্ষিপ্ত খুতবা দেন এবং দুআ করেনঃ ‘হে আল্লাহ, আপনি জায়িদকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ, আপনি জায়িদকে মাফ করুন। হে আল্লাহ, আপনি জাফর ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে মাফ করে দিন।’

জাফর ছিলেন গরীব মিসকীনদের প্রতি অত্যন্ত সদয়। আবু হুরাইরা বলেনঃ ‘‘আমাদের মিসকীন সম্প্রদায়ের জন্য জাফর ইবন আবী তালিব ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি আমাদেরকে সংগে করে তাঁর গৃহে নিয়ে যেতেন, যা কিছু তাঁর কাছে থাকত তা আমাদের খাওয়াতেন। যখন তাঁর খাবার শেষ হয়ে যেত তখন তাঁর ছোট্ট শূন্য ঘি-এর মশকটি বের করে দিতেন। আমরা তা ফেঁড়ে ভেতরে যা কিছু লেগে থাকত চেটেপুটে খেতাম। রসূলুল্লাহ স. বলতেনঃ ‘আমার আগে যত নবী এসেছেন তাঁদের মাত্র সাতজন বন্ধু দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমার বিশেষ বন্ধুর সংখ্যা চৌদ্দ এবং জাফর তার একজন’। (বুখারী, মানাকিবু জাফর)

**আবু হুজাইফা**

আবু হুজাইফা হাশীম, পিতা উতবা, মাতা ফাতিমা বিনতু সাফওয়ান। কুরাইশ গোত্রের সন্তান।

আবু হুজাইফা সাবেকীনে ইসলাম অর্থাৎ প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ব্যক্তি। তাঁর পিতা উতবা ইসলামের চরম দুশমন কুরাইশ নেতৃবৃন্দের এক প্রধান পুরুষ। ইসলামের বিরোধিতায় সে তার জীবন উৎসর্গ করেছিল। কিন্তু আল্লাহর কি মহিমা, তারই বেটা আবু হুজাইফা ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করতে মোটেও বিলম্ব করেননি। তিনি ইসলাম গ্রহণের গৌরব অর্জন করেন এবং আরো অনেকের মত কুরাইশদের হাতে নির্যাতনের শিকার হন। (উসুদুল গাবা-৫/১৭০) ইবন ইসহাক বলেন, তিনি তেতাল্লিশ (৪৩) জনের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। (ইসাবা– ৪/৪২)

আবু হুজাইফা (রা) হাবশায় দু’টি হিজারতেই অংশগ্রহণ করেন। প্রথমবার হিজরত করে আবার মক্কায় ফিরে আসেন। পরে আবার হাবশায় চলে যান। হাবশায় হিজরাতে তাঁর স্ত্রী সাহলা বিনতু সুহাইলও সাথী ছিলেন। তাঁদের পুত্র মুহম্মাদ ইবন আবী-হুজাইফা সেই প্রবাসে হাবশায় জম্মগ্রহণ করেন। (উসুদুল-গাবা – ৫/১৭০)

হাবশা থেকে দ্বিতীয়বারের মত মক্কায় ফিরে এসে তিনি দেখতে পেলেন, মক্কায় অবস্থানরত মুসলিমদের মধ্যে মদীনায় হিজরাতের হিড়িক পড়ে গেছে। তাঁর দাস সালেমকে সংগে করে তিনিও মদীনায় পৌঁছলেন এবং আব্বাদ ইবন বিশর আনসারীর অতিথি হলেন। (উসুদুল গাবা – ৫/১৭০)।

রসূলুল্লাহর (স) সময়ে সংঘটিত সকল যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে অংশগ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধে এক পক্ষে তিনি এবং অন্য পক্ষে তাঁর পিতা উতবা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। সত্য ও ন্যায়ের প্রেম সেদিন মুসলিমদেরকে আপন পর সম্পর্ক বিস্মৃত করে দিয়েছিল। সেদিন আবু হুজাইফা চিৎকার করে আপন পিতা প্রতিপক্ষের দুঃসাহসী বীর উতবাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহবান জানান।

বদর যুদ্ধে আবু হুজাইফার পিতা উতবাসহ বেশির ভাগ কুরাইশ নেতা মুসলিম বাহিনীর হাতে নিহত হয় এবং তাদের সকলের লাশ বদরের একটি কূপে নিক্ষেপ করে মাটি চাপা দেওয়া হয়। রসূল (স) সেই কূপের কাছে দাঁড়িয়ে নিহত কুরাইশ নেতৃবৃন্দের এক একজন করে নাম ধরে ডেকে বলতে লাগলেন, “ওহে উতবা, ওহে শাইবা, ওহে উমাইয়া ইবনে খালাফ, ওহে আবু জাহল! তোমরা কি আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য পেয়েছ? আমি তো আমার অঙ্গীকার সত্য পেয়েছি।” (বুখারী) ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, সে সময় আবু হুজাইফাকে খুবই উদাস ও বিমর্ষ মনে হচ্ছিল। রসূল (স) তার এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করেন, “আবু হুজাইফা, সম্ভবত তোমার পিতার জন্য তোমার কষ্ট হচ্ছে।” আবু হুজাইফা বলেন, “আল্লাহর কসম, না। তাঁর নিহত হওয়ার জন্য আমার কোন দুঃখ নেই। তবে আমার ধারণা ছিল, তিনি একজন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও সিদ্ধান্তদানকারী ব্যক্তি। তাই আমার আশা ছিল, তিনি ঈমান আনার সৌভাগ্য অর্জন করবেন। কিন্তু রসূল (স) যখন তাঁর ‘কুফর’ অবস্থায় মৃত্যুবরণের নিশ্চয়তা দান করলেন, তখন আমার দুরাশার জন্য আফসুস হলো।” এরপর রসূল (স) আবু হুজাইফার জন্য দুআ করলেন। (ইবন হিশাম– ১/৬৩৮৪১)

রসূল (স.)-এর ওফাতের পর প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে আরব উপদ্বীপে কতিপয় ভণ্ড নবীর ফিতনা ও উৎপাত শুরু হয়। ইয়ামামার মুসাইলামা কাজ্জাবও ছিল সেইসব ভণ্ড নবীর একজন। খলীফা তার বিরুদ্ধে এক বাহিনী পাঠান। এই বাহিনীতে আবু হুজাইফাও (রা) ছিলেন। মুসাইলামার বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করে তিনি ইয়ামামার রণক্ষেত্রে শহীদ হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ অথবা ৫৪ বছর।

আবু হুরায়রা

আবু হুরায়রার আসল নাম আবদুর-রহমান ইবনে সাখর। তিনি তিন বছর নবী (সা.) এর সান্নিধ্যে ছিলেন এবং বহুসংখ্যক হাদীস মুখস্থ করেন এবং বর্ণনা করেন| তাঁর কাছ থেকে ৫,৩৭৫টি হাদিস লিপিবদ্ধ হয়েছে| উর্বর দেমাগ ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি| তাঁর কাছ থেকে আটশত তাবেঈ হাদিস শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আপনারা বলে থাকেন, রসূলুল্লাহ (স.) থেকে আবূ হুরায়রা (রা.) বেশী বেশী হাদীস বর্ননা করে থাকে এবং আরো বলেন, মুহাজির ও আনসারদের কি হল যে, তারা তো রসূলুল্লাহ থেকে হাদীস বর্ননা করেন না? (ব্যাপার হল এই যে) আমার মুহাজির ভাইগণ বাজারে কেনা-বেচায় ব্যস্ত থাকতেন আর আমি কোন প্রকারে আমার পেটের চাহিদা মিটিয়ে রসূলুল্লাহ (স.)র কাছে পড়ে থাকতাম। তাঁরা যখন (কাজের ব্যস্ততায়) গরহাজির থাকতেন, আমি তখন হাজির থাকতাম। তাঁরা যা ভুলে যেতেন, আমি তা হিফজ করতাম। আর আমার আনসার ভাইয়েরা নিজেদের জমি-জিরাতের কাজে মশগুল থাকতেন। আমি ছিলাম আসহাবে ছুফফার মিসকীনদের এক মিসকীন। তাঁরা যা ভুলে যেতেন, আমি তা হিফজ করতাম। রসূলুল্লাহ তাঁর এক বর্ননায় বললেন, আমার এ কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে কেউ তার কাপড় বিছিয়ে দিবে এবং পরে নিজের শরীরের সাথে তার কাপড় জড়িয়ে নেবে, আমি যা বলছি সে তা ইয়াদ রাখতে পারবে। [আবূ হুরায়রা বলেন] আমি আমার গায়ের চাঁদর বিছিয়ে দিলাম, যবতক না রসূলুল্লাহ তাঁর কথা শেষ করলেন, পরে আমি তা আমার বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলাম। ফলে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সে কথার কিছুই ভুলি নি। (বুখারী)

আবু হুরায়রা (রা:) রেওয়ায়েত করেছেন, নবী (স.) বলেন, “কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে সে যত কথাই শোনে তা-ই বর্ণনা করে।” (সহীহ মুসলিম)

আবু হুরায়রাহ (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, নবী (ছ.) বলেন, “তোমরা অনুমান থেকে বেঁচে থাক। কারণ তা (সময়ে) সবচেয়ে বেশি মিথ্যা কথা বলে সাব্যস্ত হয়।” (বুখারী)

আবূ হুরাইরাহ (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, আল্লাহর রসূল (স.) বলেন, একদিন এক ব্যক্তি রাস্তায় চলার পথে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হল। তারপর একটি কূয়া দেখতে পেয়ে তাতে সে নামল এবং পানি পান করল। উপরে উঠে এসে সে দেখতে পেল একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার দরুন ভিজে মাটি চেটে খাচ্ছে। লোকটি বলল, এ কুকুরটির তেমনি পিপাসা পেয়েছে, যেমনি আমার পিপাসা পেয়েছিল। তারপর সে কূয়ার মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা পানি ভর্তি করে এনে কুকুরটিকে পান করাল। আল্লাহ তার এ কাজ কবূল করেন এবং তাকে মাফ করে দেন। সাহাবীগণ বলল, হে আল্লাহর রসূল! পশুদের ব্যাপারেও কি আমাদের জন্য পুণ্য রয়েছে? তিনি বললেন, প্রাণী মাত্রের সেবার মধ্যেই পুণ্য রয়েছে। (বুখারী)

আবু হুরায়রা (রা:) রেওয়ায়েত করেছেন, আল্লাহর রসূল (স.) বলেছেন, “যে সালাত পড়ল কিন্তু তাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না ঐ সালাত অপূর্ণ, অপূর্ণ, অপূর্ণ, তামাম না।” তাবেয়ী আবুল আলা বললেন, হে আবু হুরায়রা, অনেক সময় আমি ইমামের পিছে থাকি। আবু হুরায়রা (রা:) বললেন, হে পারস্যবাসী, তুমি তা মনে মনে পড়বে। আমি রসূল (স.)কে বলতে শুনেছি: মহান আল্লাহ বলনে: আমি সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মাঝে দু’ভাগে ভাগ করেছি, আমার বান্দার জন্য সে যা চাইবে। বান্দা যখন বল: “সমস্ত তারীফ আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টকূলর রব”।‎ আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার তারীফ করছে। বান্দা যখন বলে, “দয়াময়, পরম দয়ালু”। আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার গুণগান করছে। বান্দা যখন বলে, “বিচার দিবসের মালিক”। আল্লাহ বলনে: ‎আমার বান্দা আমার শ্রষ্ঠেত্ব ঘোষণা করেছে (একবার বলেছেন: আমার বান্দা তাকে আমার ওপর ন্যাস্ত করছে), বান্দা যখন বলে, “আপনারই আমরা ইবাদাত করি এবং আপনারই ‎কাছ আমরা সাহায্য চাই”। ‎আল্লাহ বলনে: এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে, আর আমার বান্দার জন্য যা সে চাইবে। যখন বান্দা বলে, “আমাদরেকে সরল পথরে হদিায়াত ‎দনি তাদের পথ, ‎যাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন। যাদের উপর ‎‎(আপনার) ক্রোধ আপততি হয়নি এবং যারা ‎পথভ্রষ্টও নয়”।‎ আল্লাহ বলেন: এটা আমার বান্দার জন্য, আমার বান্দার জন্য যা সে চাইবে”। (সহীহ মুসলিম, মুয়াত্তা, নাছায়ী ৯১০)

এই হাদীসের ব্যাখ্যা:

..................

..................

...............

.....................

.................

......................

.......

...................

আবু হুরায়রা (রা:) মুজতাহিদ ফকীহ ছিলেন।

.................

....................

সাহিবুস ছির হুজায়ফা ইবন ইয়ামান আবসী

হুজাইফার পিতা হুসাইল ছিলেন মূলতঃ মক্কার গাতফান গোত্রের বনু আবস গোত্রের লোক। ইসলামপূর্ব যুগে তিনি নিজ গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে মক্কা থেকে পালিয়ে ইয়াছরিবে আশ্রয় নেন। সেখানে বনী আবদুল আশহাল গোত্রের সাথে পহেলা মৈত্রীচুক্তি, পরে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে বাস করতে থাকেন। মদীনার আনসার গোত্রসমূহের আদি সম্পর্ক মূলতঃ ইয়ামানের সাথে। হুসাইল তাদের মেয়ে বিয়ে করায় তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁর পরিচয় দিত ‘আল-ইয়ামান’ বলে। এজন্য হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান বলা হয়। (ইছাবা- ১/৩১৭)

হুসাইলর মক্কায় প্রবেশে যে বাধা ও ভয় ছিল ধীরে ধীরে তা দূর হয়ে যায়। তিনি মাঝে মধ্যে মক্কা-ইয়াসরিবের মধ্যে যাতায়াত করতেন। তবে বেশী থাকতেন ইয়াসরিবে। এদিকে রসূল (স.) মক্কায় ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে হুজাইফার পিতা হুসাইল বনী আবসের এগারোজনকে সংগে করে রসূল (স.)-এর কাছে হাজির হয়ে ইসলাম কবুল করেন। রসূল (স.) তখনও মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেননি। সুতরাং হুজাইফা মূলে দিক থেকে মক্কার তবে মদীনায় জন্ম নেন এবং সেখানেই বড় হন। (সুওয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবা- ৪/১২২)

হুজাইফার পিতা মা মুসলিম হন মক্কায় ইসলামের প্রথম পর্বে। শেষে একদিন মক্কায় রসূলুল্লাহ স.- র দরবারে হাজির হন। হুজাইফা বলেনঃ রসূল স. হিজরত ও নুসরত (মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে অবস্থান)- এর যে কোন একটি বেছে নেওয়ার এখতিয়ার দেন। আমি নুসরতকে বেছে নিলাম। (ইছাবা- ১/৩১৮)

হুজাইফা বদর যুদ্ধে যোগদান করেননি। হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমাকে বদর যুদ্ধে যোগদান থেকে এছাড়া অন্য কিছু বিরত রাখেনি যে, আমি এবং আমার পিতা হুসায়ল ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম। এমন সময় কোরায়শ কাফির আমাদের ধরে এবং বলে যে, তোমরা অবশ্যই মুহম্মাদের কাছে যেতে মনস্থ করেছ। জওয়াবে আমরা বললাম, আমরা তার কাছে যেতে চাইনা বরং আমরা মদিনায় (ফিরে) যেতে চাই। তখন তারা আল্লাহর নামে আমাদের নিকট অঙ্গীকার নিল যে, আমরা অবশ্যই মদিনায় ফিরে যাবো এবং তাঁর সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করব না। তারপর আমরা রসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এলাম এবং সে খবর তাকে জানালাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা ফিরে যাও। আমরা তাদের কৃত ওয়াদা পুর্ণ করবো এবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করব। (সহীহ মুসলিম 4740)

হুযাইফাহ্ (রা.) বলেন, আমার মা আমাকে প্রশ্ন করেন, নবী (স.)-এর কাছে তুমি কখন যাবে? আমি বললাম, আমি এতদিন হতে তার কাছে যাই নি। এতে তিনি আমার উপর নারাজ হন। আমি তাকে বললাম, নবী (স.)-এর সঙ্গে আমাকে মাগরিব সালাত পড়তে ছেড়ে দিন। তাহলে আমি তার কাছে আমার ও আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করব। অতএব নবী -এর কাছে আমি হাজির হয়ে তার সাথে মাগরিব সালাত পড়লাম। তারপর তিনি নফল সালাত পড়তে থাকলেন, অবশেষে তিনি এশার সালাত পড়লেন। তারপর তিনি বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন এবং আমি তার পিছু পিছু গেলাম। তিনি আমার আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং প্রশ্ন করলেন, তুমি কে, হুযাইফাহ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ তোমার কি দরকার, আল্লাহ তোমাকে এবং তোমার মাকে মাফ করুন। (তিরমিজী 4150)

হুজাইফা উহুদ যুদ্ধে তাঁর পিতার সাথে যোগদান করেন। তিনি দারুণ সাহসের সাথে যুদ্ধ করেন এবং নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন। তবে তাঁর বৃদ্ধ পিতা শহীদ হন। আর সে শাহাদত ছিল স্বপক্ষীয় মুসলিম সৈনিকদের হাতে। ঘটনাটি এ রকমঃ উহুদ যুদ্ধের সময় হুসাইল ও ছাবিত ইবন ওয়াকশ এই দুই বৃদ্ধকে রাখা হয় নারী ও শিশুদের কেল্লার তত্তাবধানে। যুদ্ধ যখন তীব্র আকার ধারণ করে তখন আল-ইয়ামান সঙ্গী ছাবিতকে বললেনঃ তোমার বাপ নিপাত যাক! আমরা কিসের অপেক্ষায় বসে আছি? আমাদের আয়ুও শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের কি উচিত নয়, তরবারি হাতে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছ চলে যাওয়া? তাঁরা দু’জন তরবারি হাতে নিয়ে কেল্লা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। এদিকে যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুশরিক বাহিনী পরাজয় বরণ করে পালাচ্ছিল। কিন্তু হুজাইফার পিতা না চেনার কারণে হুসাইল মুসলমদের হাতে শহীদ হন।

হুজাইফা পিতার মৃত্যু বলেন, ‘আল্লাহ তোমাকে সকলকে ক্ষমা করুন। তিনিই সর্বাধিক দয়ালু।’

রসূল (সা.) হুজাইফাকে তাঁর পিতার ‘দিয়াত’ বা রক্তমূল্য দিতে চাইলে তিনি তাঁর দিয়াত (রক্তমূল্য) মুসলিমদের জন্য দান করেন। (ইবন হিশাম- ২/৮৭)

হুজাইফা খন্দক যুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইবরাহীম তায়মী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আমরা হুযায়ফা (রা.)-এর কাছে ছিলাম। তখন একজন বলল, হায়, আমি যদি রসুলুল্লাহ (স.) কে পেতাম, তবে তাঁর সঙ্গে মিলে একত্রে যুদ্ধ করতাম এবং তাতে যথাসাধ্য করতাম। হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, তুমি তাই করতে? কিন্তু আমি আহযাবের রাতে রাসুলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। (সে রাতে) প্রচন্ড বায়ু ও তীব্র শীত আমাদের কাবু করে ফেলেছিল। এমনি সময় রসুলুল্লাহ বললেন, ওহে! এমন কেউ আছে কি, যে আমাকে শক্রর খবর এনে দেবে; আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে রাখবেন? আমরা তখন চুপ করে রইলাম এবং আমাদের মধ্যে কেউ তার সে আহবানে সাড়া দেয়নি। তিনি আবার বললেন, “ওহে! এমন কেউ আছে কি” যে আমাকে শক্রর খবর এনে দেবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে রাখবেন” এবারও আমরা চুপ রইলাম আর আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি। তিনি আবার বললেন, ওহে! এমন কেউ আছে কি যে আমাকে শক্রর খবর এনে দেবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন তাকে আমার সঙ্গে রাখবেন, এবারও আমরা চুপ করে রইলাম এবং আমাদের কেউ তাঁর আহবানে সাড়া দেয়নি। এবার তিনি বললেনঃ হে হুযায়ফা, ওঠো এবং তুমি দুশমনের খবর আমাদের এনে দাও। রসুলুল্লাহ যখন এবার আমার নাম ধরেই ডাক দিলেন, তাই উঠা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিলনা। এবার তিনি বললেনঃ শক্রপক্ষের খবর আমাকে এনে দাও, কিন্তু সাবধান তাদের আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করো না। তারপর আমি যখন তাঁর কাছ থেকে প্রস্থান করলাম, তখন মনে হচ্ছিল আমি যেন হাম্মামের মধ্য দিয়ে চলছি। এভাবে আমি তাদের (শক্রপক্ষের) কাছে পৌছলাম। তখন আমি লক্ষ্য করলাম আবূ সুফিয়ান আগুনের দ্বারা তাঁর পিঠে ছেক দিচ্ছে। আমি তখন একটি তীর ভুলে ধনুকে সংযোজন করলাম এবং তা নিক্ষেপ করতে মনস্থ করলাম এমন সময় আমার মনে পড়ল যে, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তাদেরকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলো না।" আমি যদি তখন তীর নিক্ষেপ করতাম তবে তীর নির্ঘাৎ লক্ষ্যভেদ করত। অগত্যা আমি ফিরে এলাম এবং ফিরে আসার সময়ও গরম হাম্মামের মধ্য দিয়ে অতিক্রমের মতো গরম অনুভব করলাম। তারপর যখন ফিরে এলাম, তখন প্রতিপক্ষের খবর তাঁকে দিলাম। আমার দায়িত্ব থেকে অবসর হতেই আবার আমি শীতের তীব্রতা অনুভব করলাম।

তখন রসুলুল্লাহ তার খোলা অতিরিক্ত জুব্বার অংশ দিয়ে আমাকে আবৃত করলেন, যা তিনি সালাত পড়ার সময় গায়ে দিতেন। তারপর আমি ভোর পর্যন্ত একটানা ঘুমালাম। যখন ভোর হল তখন তিনি বললেন, হে নাওমান (ঘুমকাতুরে)! এখন উঠে পড়ো। (সহীহ মুসলিম 4741)

হুজায়ফা বলেন, আমি আঁধারের আড়ালে দুশমন ঘাঁটিতে ঢুকলাম এবং তাদের একজন হয়ে গেলাম। আবু সুফিয়ান দাঁড়াল ও বলল, হে কুরাইশ, তোমাদের প্রত্যেকে দেখ তার কাছে বসা লোকটি কে? শোনামাত্র আমি আমার কাছে বসা লোকটির হাত ধরলাম ও বললাম, তুমি কে? আবু সুফিয়ান বলল, হে লোকেরা, আমাদের ঘোড়া ও উট হালাক হয়ে গেছে। কুরাইজা গোত্র আমাদের ত্যাগ করেছে এবং তাদের সম্পর্কে আমরা অপছন্দনীয় খবর পাচ্ছি। ঠাণ্ডা হাওয়া আমাদের আঘাত করছে। আমাদের আগুন জ্বলছে না। আমাদের তাঁবু উপড়ে গেছে। তোমরা ভাগো। আমি যাচ্ছি। [[1]](#footnote-1)

একথা বলে তিনি উটের রশি খুললেন এবং পিঠে চড়ে বসে তার গায়ে আঘাত করলেন। উট চলতে শুরু করল।

খন্দক পরবর্তী রসূল স.)এর জীবদ্দশায় বা তাঁর পরের সকল অভিযানে শরীক হন। রসুল (সা.)-এর ওফাতের পর তিনি ইরাকে বসতি স্থাপন করেন। তারপর বিভিন্ন সময় কূফা, নিসিবীন ও মাদায়েনে বাস করেন। (উসুদুল গাবা- ১/৩৯৪)

হুজাইফা পারস্যের নিহাওয়ান্দ, দিনাওয়ার, হামজান, মাহ্ রায় প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন। (তাহজীবুত তাহজীব- ২/১৯৩)

উমর (রা.) হুযায়ফা বিন য়ামান এবং উছমান বিন হুনায়ফকে ইরাকের রাজস্ব নির্ধারণ করতে পাঠিয়েছিলেন। তারা ইরাক থেকে প্রত্যাবর্তন করে তাদের রিপোর্ট দাখিল করলে উমর (রা.) বললেন, তোমরা এটা কী করলে? তোমরা কি এটা ভেবে দেখেছ যে ইরাকের উপর তোমরা এতটা করের বোঝা আরোপ করছো যা ঐ ভূখণ্ড বহন করতে অক্ষম? তারা বললেন, না। উমর বললেন, আল¬াহ যদি আমাকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখেন তবে আমি ইরাকী দুস্থ ও বিধবা মহিলাদেরকে এতটা স্বচ্ছল করে দেব যে আমার পর তারা অন্য কারো মুখাপেক্ষী হবে না। (সহীহ বুখারী ৩৭০০)

হুজাইফা (রা.) ইয়ারমুক যুদ্ধে শরীক হন।

হিজরী ১৮ সনে নিহাওয়ান্দের ওপর সেনা অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি নেয়া হয়। অবশ্য আবু উবাইদাহ বলেন, হিজরী ২২ সনে হুজাইফা নিহাওয়ান্দে যান। (ইবন আসাকির ১/১০০) এই নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে পারসিক সৈন্যসংখ্যা ছিল দেড় লাখ। উমার (রা.) মুসলিম বাহিনীর কায়েদ নিয়োগ করেন নুমান ইবন মুকাররিনকে। তারপর তিনি কূফায় অবস্থানরত হুজাইফাকে একটি চিঠিতে সেখান থেকে একটি বাহিনী নিয়ে নিহাওয়ান্দের দিকে যাত্রা করার জন্য নির্দেশ দেন। এদিকে খলীফা মুসলিম মুজাহিদদের প্রতি জারি করা এক ফরমানে বললেন, চারিদিক থেকে মুসলিম সৈন্যরা যখন এক স্থানে সমবেত হবে তখন প্রত্যেক জায়গা থেকে আগত বাহিনীর একজন করে আমীর থাকবে। আর গোটা বাহিনীর কায়েদ হবেন নুমান ইবন মুকাররিন। নুমান যদি শাহীদ হন, হুজাইফা হবেন পরবর্তী আমীর। আর তিনি শহীদ হলে আমীর হবেন জারীর ইবন আবদল্লাহ। এভাবে খলীফা সে ফরমানে একের পর এক সাতজন সেনাপতির নাম ঘোষণা করেন। নুমান নিহাওয়ান্দের অদূরে শিবির স্থাপন করে বাহিনীর দায়িত্ব বন্টন করেন। সেখানে হুজাইফাকে দক্ষিণ ভাগের অফিসার নিয়োগ করা হয।

দুই বাহিনী মুখোমুখি হলো। দুশমন সৈন্য দেড় লাখ, আর মুসলিম সৈন্য মাত্র তিরিশ হাজার। তুমুল যুদ্ধ হলো। ইতিহাসে এমন যুদ্ধের নজীর খুব কমই আছে। মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক নুমান শহীদ হলেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে তিনিও হুজাইফাকে আমীর নিয়োগের অসীয়ত করে যান। তাঁর শাহাদতের পর আশেপাশের সৈনিকরা যখন নতুন আমীর তালাশ করছে তখন মাকাল হুজাইফার দিকে ইশারা করে বলেন, ইনিই তোমাদের পরবর্তী আমীর। আশা করা যায়, আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে তোমাদের বিজয় দান করবেন।

হুজাইফা (রা.) সেনাপতির দায়িত্ব নিলেন। যুদ্ধ তখন ঘোরতর রূপ ধারণ করেছে। তিনি পার্শ্ববর্তী লোকদেরকে নুমানের শাহাদতের খবর প্রচার করতে নিষেধ করলেন। আর সাথে সাথে নুমানের জায়গায় ভাই নুয়াঈমকে দাঁড় করালেন। যাতে নুমানের শাহাদতে যুদ্ধের ওপর কোন রকম প্রভাব না পড়ে। এ কাজগুলি তিনি করলেন মুহূর্তের মধ্যে। তারপর তিনি ঝড়ের গতিতে চিড়ে-ফেঁড়ে পারসিক বাহিনীর সামনে পৌঁছেন. তারপর তনি নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে টান মেরে দুশমন বাহিনীর দিকে ফিরিয়ে জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেনঃ ‘ওহে মুহম্মাদ (স.)-এর অনুসারীরা! এখানে, এদিকে জান্নাত তোমাদের স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তোমরা আর দেরী করো না। ওহে বদরের যোদ্ধারা! ছুটে এস। ওহে খন্দক, উহুদ ও তাবুকের বীরেরা! সামনে এগিয়ে চল।’ এভাবে তিনি সেদিন নজীরবিহীন সাহস ও বিজ্ঞতার পরিচয দেন। (জাহাবী তারীখ- ২/৩৯-৪১)

ইবন আসাকির বলেন, নিহাওয়ান্দের শাসক বাৎসরিক আট লাখ দিরহাম জিযিয়া দানের ওয়াদা করে হুজাইফার সাথে সন্ধি করেন। নিহাওয়ান্দের পর তিনি বিনা বাধায় ‘দিনাওয়ার’ জয় করেন। সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাছ পূর্বেই এ দিনাওয়ার জয় করেছিলেন; কিন্ত অধিবাসীরা বিদ্রোহ করে। তারপর হুজাইফা বিনা যুদ্ধে একে একে মাহ্, হামাজান, ও রায় জয় করেন। (ইবন আসাকির- ১/১০০)

বালাজুরীর বর্ণনা মতে হিজরী ২২ সনে আজারবাইজান অভিযানে হুজাইফা গোটা বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন। তিনি নিহাওয়ান্দ থেকে আজারবাইজানের আরদাবীলে পৌঁছেন। এখানকার শাসক মাজেরওয়ান, মায়মন্দ, সুরাত, সাব্জ, মিয়াঞ্চ প্রভৃতি স্থান থেকে একটি বাহিনী সংগ্রহ করে প্রতিরোধের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এরপর বাৎসরিক আট লাখ দিরহাম জিজিয়া দানের শর্তে সন্ধি করে। হুজাইফা সেখান থেকে মুকাম ও রুজাইলার দিকে অগ্রসর হন এবং বিজয় লাভ করেন। এর মধ্যে মদীনার খলীফার দরবার থেকে তাঁর বরখাস্তের নির্দেশ হাতে পৌঁছে। তাঁর জায়গায় উতবা ইবন ফারকাদকে নিয়োগ করা হয। (বিস্তারিত বর্ণনা তারীখে বালাজুরীতে এসেছে)

সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে মাদায়েন বিজিত হওয়ার পর মুসলিম বাহিনী সেখানে অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া আরব মুসলিমদের স্বাস্থ্যসম্মত না হওয়ায় উমার (রা.) সাদকে তাঁর বাহিনী নিয়ে কূফায় চলে যেতে বলেন এবং সেখানে একটি স্বাস্থ্য উপযোগী জায়গা নির্বাচন করে স্থায়ী সেনাছিউনী তখা শহর পত্তনের নির্দেশ দেন। সাদ (রা.) শহর পত্তনের জন্য হুজাইফা ও সালমান ইবন জিয়াদের ওপর জায়গা নির্বাচনের দায়িত্ব দেন। তাঁরা দু’জন গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর একটি স্বাস্থ্যকর জায়গা নির্বাচন করেন। কূফা শহর এ দুজনেরই নির্বাচিত জায়গায় অবস্থিত। (রিজালুন হাওলার রসুল ২০০)

উল্লেখিত অভিযানসমূহের পর উমর (রা.) তাকে মাদায়েনের ওয়ালী নিয়োগ করেন। (ইবন আসাকির- ১/৯৪) একজন নতুন ওয়ালী আসছেন- এ খবর মাদায়েনবাসীদের কাছে পৌঁছল। নতুন আমীরকে খোশআমদেদ জানানোর জন্য তারা দলে দলে শহরের বাইরে সমবেত হল। তারা এ মহান সাহাবীর তাকওয়া, সরলতা ও ইরাক বিজয়ের অনেক কথা শুনেছিল। তারা তাঁর একটি জাঁকজমকপূর্ণ কাফিলার সাথে আগমনের এন্তেজারে ছিল। তারা দেখতে পেল: না, কোন কাফিলার সাথে নয়, কিছু দূরে গাধার ওপর সওয়ার হয়ে দীপ্ত চেহারার এক ব্যক্তি তাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। গাধার পিঠে অতি পুরনো একটি জিন। তার ওপর বসে বাহনের পিঠের দু’পাশের পা ছেড়ে দিয়ে এক হাতে রুটি ও অন্য হাতে লবন ধরে মুখে ঢুকিয়ে চিবোচ্ছেন। আরোহী ধীরে ধীরে জনতার মাঝখানে এসে পড়লেন। তারা ভালো করে তাকিয়ে দেখে বুঝল, ইনিই সেই ওয়ালী যার এন্তেজারে তারা দাঁড়িয়ে আছে। পারস্যের খসরু বা তাঁর আগ থেকে তাদের দেশে এমন ওয়ালীর আগমন আর কখনো ঘটেনি।

তিনি চললেন এবং লোকেরাও তাঁকে ঘিরে পাশাপাশি চলল। তিনি আবাসস্থলে পৌঁছে সমবেত জনতাকে তাদের প্রতি লেখা খলীফার ফরমান পাঠ করে শোনালেন। উমার (রা.)-এর নিয়ম ছিল, নতুন ওয়ালী বা শাসক নিয়োগের সময় সেই এলাকার অধিবাসীদের প্রতি বিভিন্ন নির্দেশ ও ওয়ালীর দায়িত্ব ও কর্তব্য স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া। কিন্তু হুজাইফা (রা.)-এর নিয়োগপত্রে মাদায়েনবাসীর প্রতি শুধু একটি নির্দেশ ছিলঃ ‘তোমরা তাঁর কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে।’ তিনি যখন তাদের সামনে খলীফার এ ফরমান পড়ে শোনালেন, তখন চারদিক থেকে আওয়াজ উঠল, বলুন, আপনার কী দরকার। আমরা সবই দিতে প্রস্তুত। হজাইফা বললেনঃ ‘আমার নিজের পেটের জন্য শুধু কিছু খাবার, আর আমার গাধাটির জন্য কিছু ঘাস-খড় প্রয়োজন। যতদিন এখানে থাকব, আপনাদের কাছে শুধু এতটুকুই চাইব।’ তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে আরো বললেনঃ ‘তোমরা ফিতনার স্থানগুলি থেকে দূরে থাকবে। লোকেরা জানতে চাইল, ফিতনার স্থানগুলি কি? বললেনঃ আমীরদের বাড়ীর দুয়ারসমূহ। তোমাদের কেউ আমীরের কাছে এসে মিথ্যা দ্বারা তার সত্যায়িত করবে এবং তার মধ্যে যা নেই তাই বলে তার প্রশংসা করবে- এটাই মূলতঃ ফিতনা।’ এ পদে কিছুদিন থাকার পর কোন এক কারণে উমার (রা.) তাঁকে মদীনায় তলব করেন। খলীফার ডাকে সাড়া দিয়ে হুজাইফা (রা.) যে অবস্থায় একদিন মাদায়েন গিয়েছিলেন ঠিক একই অবস্থায় মদীনার দিকে যাত্রা করেন। হুজাইফা আসছেন, এ খবর পেয়ে খলীফা মদীনার কাছাকাছি পথের পাশে এক জায়গায় লুকিয়ে থাকেন। কাছে আসতেই হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ান এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেনঃ ‘হুজাইফা, তুমি আমার ভাই, আর আমিও তোমার ভাই।’ তারপর সেই পদেই তাঁকে বহাল রাখেন। (ইবন আসাকির- ১/১০০; আ’লাম- ২/১৭১)

হুজাইফা (রা.) এক ইহুদী নারীকে বিয়ে করেন। খবর পেয়ে উমার (রা.) চিঠি লেখেন, যেন তিনি উক্ত মহিলা থেকে বিচ্ছিন্ন হন। হুজাইফা খলীফাকে লেখেন, যদি কিতাবী নারী বিয়ে করা হারাম হয় তাহলে তাকে তালাক দিব। জবাবে উমার (রা.) বলেনঃ আমি এটা হারাম মনে করি না তবে আমার ভয় হয় কেন তোমরা মুসলিম মহিলা বিয়ে করছ না? (বায়হাকী 7/172, সনদ সহীহ, ইবনে কাছীর)

উছমান (রা.)-এর খিলাফতকালের পুরো সময়টা এবং আলী (রা.)-এর খিলাফতের কিছু দিন, একটানা এ দীর্ঘ সময় তিনি মাদায়েনের ওয়ালী পদে আসীন ছিলেন। (ইছাবা-১/৩১৭) উছমান (রা.)-এর খিলাফতকালে হিজরী তিরিশ সনে সাঈদ ইবন আসের সাথে কূফা থেকে খোরাসানের উদ্দেশ্যে বের হন। তুমাইস বন্দরে দুশমন বাহিনীর সাথে ভীষণ সংঘর্ষ হয়। এখানে সাঈদ ইবন আস ভীতিকালীন সালাত (সালাতুল খওফ) পড়েন। তিনি সালাত পড়ানোর আগে হুজাইফার কাছ থেকে তার পদ্ধতি জেনে নেন। (মুসনাদ-৫/৩৮৫) এরপর তিনি ‘রায়’-এ যান এবং সেখান থেকে সালমান ইবন রবীয়া ও হাবীব ইবন মাসলামার সাথে আরমেনিয়ার দিকে আগে বাড়েন।

হিজরী ৩১ সনে ‘খাকানে খাযার’-এর বাহিনীর সাথে বড় ধরণের একটি সংঘর্ষ হয়। এতে সালমানসহ প্রায় চার হাজার মুসলিম শহীদ হন। সালমানের শাহাদতের পর হুজাইফা গোটা বাহিনীর কায়েদ হন। কিন্তু কিছুদিন পর তাঁকে অন্যত্র বদলী করা হয় এবং তাঁর জায়গায় মুগীরা ইবন শুবাকে নিয়োগ করা হয। হুজাইফা (রা.) ‘বাব’-এর ওপর তিনবার অভিযান চালান। তৃতীয় হামলাটি ছিল হিজরী ৩৪ সনে। এ অভিযান ছিল উছমান (রা.)-এর খিলাফতের শেষ দিকে। এ সকল অভিযান শেষ করে তিনি মাদায়েনে নিজ পদে ফিরে আসেন।

মাদায়েনে পৌঁছার পর তিনি উছমান (রা.)-এর শাহাদতের ঘটনা জানেন।

উছমান (রা.)-এর শাহাদাতের মাত্র চল্লিশ দিন পর তিনিও ইন্তিকাল করেন। এটা হিজরী ৩৬ সন মুতাবিক ৬৫৮ ইংরেজি সনের ঘটনা। (ইছাবা- ১/৩১৮)

মৃত্যুর আগে তিনি আলীর (রা.) কাছ বাইয়াত করার জন্য দুই ছেলেকে অসীয়ত করেন। তাঁরা দু’ জনই আলীর (রা.) বাইয়াত করেন এবং ছিফফীন যুদ্ধে শহীদ হন। (ইসতীয়াবঃ ইছাবার টীকা- ১/২৭৮) হুজাইফা (রা.) নিজেও আলীর কাছ বাইয়াত করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

হুজাইফা (রা.) ছিলেন শ্রেষ্ঠ আলিম সাহাবীদের একজন। মুনাফিকদের সম্পর্কে তাঁর জানা ছিল কারণে তাঁকে রসূলুল্লাহর গোপন জ্ঞানের অধিকারী বা ‘সাহিবুস সির’ বলা হতো। (তিরমিজী 3811)

আলকামাহ (রহ.) বলেন, আমি সিরিয়ায় গেলাম। দুই রাকআত সালাত পড়ে দুআ করলাম, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে একজন নেককার সাথী মিলিয়ে দিন। এরপর আমি একটি জামাআতের কাছে এসে তাদের কাছে বসলাম। তখন একজন বৃদ্ধ লোক এসে আমার পাশেই বসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তারা উত্তরে বললেন, ইনি আবূ দারদা (রা.)। আমি তখন তাঁকে বললাম, একজন নেককার সঙ্গীর জন্য আমি আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলাম। আল্লাহ আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, তুমি কোথাকার অধিবাসী? আমি বললাম, আমি কুফার অধিবাসী। তিনি বললেন, (নবী স.-এর) জুতা, বালিশ এবং উযূর পাত্র বহনকারী সর্বক্ষণের সহচর ইবনু উম্মে আবদ (রা.) কি তোমাদের ওখানে নেই? তোমাদের মাঝে কি ঐ ব্যক্তি নেই যাকে আল্লাহ শয়তান হতে নিরাপত্তা দান করেছেন? [অর্থাৎ আম্মার ইবন ইয়াসির (রা.)] তোমাদের মধ্যে কি নবী (স)-এর গোপন তথ্যবিদ লোকটি নেই? যিনি ছাড়া অন্য কেউ এসব রহস্য জানেন না। অর্থাৎ হুজাইফাহ (রা.) (বুখারী)

হুযাইফাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সকল বিষয় ফিতনার কথা বর্ণনা করলেন। তারপর যে স্মরণ রাখবার সে স্মরণ রাখল এবং যে ভুলে যাবার সে ভুলে গেল। তিনি বলেন, আমার এ সঙ্গীগণ জানেন যে, তন্মধ্যে কতক বিষয় এমন আছে, যা আমি ভুলে গেছি। কিন্তু সেটা সংঘটিত হতে দেখে আমার তা আবার মনে পড়ে যায়। যেরূপ কোন লোক দূরে চলে গেলে তার চেহারার কথা মানুষ ভুলে যায়। এরপর তাকে দেখে সে চিনে নেয়। (সহীহ মুসলিম 7445)

হুযায়ফা (রা.) বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সমুদয় ফিতনা সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (স.) আমাকে খবর দিয়েছেন। ফিতনা সংক্রান্ত সমুদয় বিষয় সম্পর্কে আমি তাকে প্রশ্ন করেছি। তবে মদীনাবাসীকে কিসে মদীনা হতে বের করবে এ বিষয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করিনি। (সহীহ মুসলিম 7447)

আর একবার হুজাইফা সম্পর্কে আবু জর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে বললেনঃ তিনি যেমন যাবতীয় জটিল ও বিস্তারিত বিষয়ে এলেম রাখেন, তেমনিভাবে মুনাফিকদের নামও জানেন। মুনাফিকদের সম্পর্কে যদি তুমি জানতে চাও তাহলে এ বিষয়ে তাঁকে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিই পাবে। (ইবন আসাকির ৪/৯৭)

তিনি সরাসরি রসূল (সা.) ও উমার (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাহজীবুত তাহজীব ২/১৯৩) ‘খুলাসা’ গ্রন্থের লেখক তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এক শো’র বেশী বলে উল্লেখ করেছেন। যে সকল সাহাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নামঃ জাবির ইবন আবদিল্লাহ, জুনদুব ইবন আবদিল্লাহ বাজালী, আবদুল্লাহ ইবন ইয়াজীদ খুতামী, আবুত তুফাইল, আলী ইবন আবী তালিব, উমার ইবন খাত্তাব। (তাহজীবুত তাহজীব ২/১৯৩) তাবেঈদের মধ্যে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এমন কয়েকজনের নাম: কায়স ইবন আবী-হাজেম, আবু ওয়ায়িল, জায়িদ ইবন ওয়াহাব, রিব’ঈ ইবন খিরাশ, যার ইবন হুবাইশ, আবু জাবইয়ান, হুসাইন ইবন জুনদুব, সিলা ইবন যুফার, আবু ইদরীস খাওলানী, সুওয়াইদ ইবন ইয়াজীদ নাখঈ, আবদুর রহমান ইবন ইয়াজীদ, আবদুর রহমান ইবন আবী লাইলা, হাম্মাম ইবন হারেস, ইয়াজীদ ইবন শুরাইত তাঈমী, বিলাল ইবন হুজাইফা প্রমুখ। (ইছাবা ১/৩১৮)

হুজাইফা (রা.) বলেন, একদা আমরা উমর (রা.)–এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, ফিতনা সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (স.)-এর বক্তব্য তোমাদের মধ্যে কে স্মরণ রেখেছ? হুজাইফা (রাঃ) বললেন, ‘যেমনি তিনি বলেছিলেন হুবহু তেমনই আমি মনে রেখেছি’। উমর (রাঃ) বললেন, রসূল (স.)–এর বাণী স্মরণ রাখার ব্যপারে তুমি খুব দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছ। আমি বললাম, মানুষ নিজের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পাড়া-পড়শীদের ব্যাপারে যে ফেতনায় পতিত হয় সালাত, সিয়াম, সাদাকা, (ন্যায়ের) আদেশ ও (অন্যায়ের) নিষেধ তা দূরীভূত করে দেয়। উমর (রা.) বললেন, তা আমার উদ্দেশ্যে নয়। বরং আমি সেই ফিতনার কথা বলছি, যা সমুদ্রতরঙের ন্যায় ভয়াল হবে। হুজাইফা (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! সে ব্যাপারে আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। কেননা, আপনার ও সে ফিতনার মাঝখানে একটি বন্ধ দুয়ার রয়েছে। উমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, সে দুয়ারটি ভেঙ্গে ফেলা হবে, না খুলে দেওয়া হবে? হুজাইফা (রাঃ) বললেন, ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমর (রাঃ) বললেন, তাহলে আর কোন দিন তা বন্ধ করা যাবে না। [হুজাইফা (রাঃ)–এর ছাত্র শাকীক (রহঃ) বললেন], আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, উমর (রাঃ) কি সে দুয়ারটি সম্পর্কে জানতেন? হুজাইফা (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, দিনের পূর্বে রাতের আগমন যেমন সুনিশ্চিত, তেমনি নিশ্চিতভাবে তিনি জানতেন। কেননা আমি তার কাছে এমন একটি হাদিস বর্ণনা করেছি, যা মোটেও ভুল নয়। এ বিষয়ে হুজাইফা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করতে আমরা ভয় পাছিলাম। তাই, আমরা মাছরূক (রহঃ)–কে বললাম এবং তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, দুয়ারটি উমর (রাঃ) নিজেই। (বুখারী 525)

হুজাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন, মানুষের মধ্যে যারা ইসলামের কলেমা উচ্চারণ করেছে, তাদের নাম তালিকাভুক্ত করে আমাকে দাও। হুজাইফা (রাঃ) বলেন, তখন আমরা এক হাজার পাঁচশ লোকের নাম তালিকাভুক্ত করে তাঁর কাছে আরজ করি। তখন আমরা বলতে লাগলাম, আমরা একহাজার পাঁচশত লোক এক্ষণে আমাদের ভয় কিসের? (রাবী) হুজাইফা (রা.) বলেন, পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে, আমরা এমনভাবে ফিতনা পতিত হয়েছি যাতে লোকেরা ভীত অবস্থায় একা একা সালাত পড়ছে। (সহীহ বুখারী ৩০৬০)

একবার হুজাইফা বললেন, রসূল (স.) আমাদেরকে দুইটি কথা বলেছিলেন। যার একটি আমি দেখেছি, আর অন্যটির এন্তেজারে আছি। এমন এক সময় ছিল যখন আমি যে আমীরের হাতেই বাইয়াত করতাম, তার ব্যাপারে আমার মধ্যে কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ দেখা দিতনা। আমি বিশ্বাস করতাম, তার ব্যাপারে আমার মধ্যে কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ দেখা দিতনা। আমি বিশ্বাস করতাম, সে মুসলিম হলে ইসলামের দ্বারা, আর খ্রীস্টান হলে মুসলিম কর্মচারী দ্বারা আমাদেরকে শাসন করবে। কিন্তু এখন আমি বাইয়াতের ব্যাপারে দ্বিধাবোধ করি। আমার দৃষ্টিতে বাইয়াতের জন্য যোগ্য ব্যক্তি মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন আছে। আমি কেবল তাদের হাতে বাইয়াত করতে পারি। (বুখারী)

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের পর তিনি সময় খুব কম পেতেন। তা সত্ত্বেও যখনই সুযোগ হত হাদীসের দারস দিতে বসতেন। কূফার মসজিদে দারসের হালকা বসত এবং তিনি সেখানে হাদীস বর্ণনা করতেন। (মুসনাদ- ৫/৪০৩) জাবির বলেন, হুজাইফা (রা.) আমাদের বলতেন, আমাদের ওপর এই ইলমের দায়িত্ব চাপানো হয়েছে। আমরা তোমাদের কাছে তো পৌঁছাব- যদিও তার ওপর আমরা আমল না করি। (কানজুল উম্মাল- ৭/২৪)

দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতার সাথে সাথে ইবাদতে গভীরভাবে মশগুল থাকতেন। একবার তিনি রসূল (স.)-এর সাথে সারা রাত সালাত পড়েন। এর মধ্যে একবারও ‘উহু’ শব্দটি উচ্চারণ করেননি। (মুসনাদ- ৫/৪০০)

হুজাইফা (রা.) বলেন, এক রাতে আমি নবী (স.)-এর সঙ্গে সালাত পড়েছিলাম। তিনি সুরা বাকারা শুরু করলেন, আমি মনে করলাম সম্ভবত একশত আয়াতের মাথায় রুকু করবেন। কিন্তু তিনি অগ্রসর হয়ে গেলেন। তখন আমি ভাবলাম, তিনি সূরা বাকারা দিয়ে সালাত পূর্ণ করবেন। কিন্তু তিনি সূরা নিসা আরম্ভ করলেন এবং তাও পড়ে আলে ইমরান শুরু করে তাও পড়ে ফেললেন। তিনি ধীর-স্থিরতার সাথে পাঠ করে যাচ্ছিলেন। যখন তাসবীহ যুক্ত কোন আয়াতে উপনীত হতেন তখন তাসবীহ পাঠ করতেন এবং যখন প্রার্থনার কোন আয়াতে উপনীত হতেন তখন তিনি প্রার্থনা করে নিতেন। আর যখন (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় গ্রহণের আয়াতে পৌছতেন তখন (আল্লাহর কাছে) পানাহ চাইতেন। তারপর রুকু করলেন এবং রুকুতে সুবহানা রব্বীয়াল আজীম বলতে থাকেন। তার রুকু ছিল প্রায় তার দাঁড়ানোর সমান (দীর্ঘ)। এরপর বললেন, ছামিয়া আল্লাহু লিমান হামিদা। তারপর দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন রুকুতে যতক্ষন ছিলেন তার কাছাকাছি। তারপর সিজদা করলেন এবং সুবহানা রব্বীয়াল আ’লা, বললেন। তাঁর সিজদার পরিমাণ ছিল তার দাঁড়ানোর কাছাকাছি। বর্ণনাকারী বলেন, জারীর (রহ.) এর হাদীসে অতিরিক্ত রয়েছে যে, নবী বললেন, ছামিয়া আল্লাহু লিমান হামিদা রব্বানা লাকাল হামদ। (সহীহ মুসলিম 1850)

একবার কিছু লোক এক স্থানে জটলা করে বসে কথা বলছিল। হুজাইফা তাদের কাছে এসে বললেন, রসূলের স. সময়ে এমন জটলা করে কথা বলা ‘নিফাকের’ (কপটতা) মধ্যে গণ্য করা হতো। (মুসনাদ- ৫/৩৮৪)

একদিন হুজাইফা (রা.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে রুকূ ও সিজদা ঠিকমত করছে না। তিনি তাকে বললেন, তোমার সালাত হয়নি। যদি তুমি (এই অবস্থায়) মারা যাও, তা হলে আল্লাহ্ কর্তৃক মুহাম্মদ (স.)কে প্রদত্ত আদর্শ হতে বিচ্যুত অবস্থায় তুমি মারা যাবে। (সহীহ বুখারী 755)

রসূল (স.)-এর সাথে তাঁর গভীর নৈকট্য ও অন্তরঙ্গতা ছিল। বহু ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার রসূল (স.) তাঁর বুকে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। (মুসনাদ- ৫/৩৮৩) আর একবার পাজামার সীমা বলতে গিয়ে তাঁর পবিত্র হাত হুজাইফার (রা.) পায়েল নালা স্পর্শ করেছিল। (মুসনাদ-৫/৩৮২)

হুজাইফা ছিলেন ক্ষমা ও সহনশীল। তার পিতাকে যাঁরা ভুলক্রমে হত্যা করেছিল তিনি তাদের প্রতি উত্তেজিত বা তাদের থেকে শোধ নেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেননি; বরং আল্লাহর দরবারে তাদের এ ভুলের মাগফিরাত কামনা করেছেন। উরওয়া বলেনঃ ক্ষমা ও সহনশীলতার গুণ হুজাইফা (রা.)-এর মধ্যে আমরণ বিদ্যমান ছিল। (বুখারী- ২/৫৮১)

হুজাইফা খুব কমই উত্তেজিত হতেন। তবে শরীয়তের হুকুম যথাযথভাবে পালিত হতে না দেখলে তাঁর রগের কোন সীমা থাকত না। শরীয়তের বিন্দুমাত্র এদিক ওদিক হওয়া সহ্য করতেন না। মাদায়েনে থাকাকালে একবার এক রয়িসের ঘরে পানি চাইলেন। রয়িস রূপোর পাত্রে পানি দিলে তিনি ভীষণ রাগ করেন। পাত্রটি রয়িসের হাত থেকে নিয়ে তার গায়ে ছুড়ে মারেন। তারপর বলেন, আমি কি তোমাকে সতর্ক করে দিইনি যে, রসুল (স.) সোনা-রূপোর পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করেছেন?

উছমান (রা.) কুরআনের যে স্ট্যান্ডার্ড কপি তৈরী করেন এবং খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান, তার নেপথ্যে প্রধান ভূমিকা পালন করেন মূলত হুজাইফা (রা.)। আনাস (রা.) বলেন, ‘হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান সিরিয়াবাসীদের সাথে ইরাক, আরমেনিয়া ও আজারবাইজান অভিযানে শরীক হন। তিনি এ সকল এলাকার নবদীক্ষিত অনারব মুসলিমদের কুরআন পাঠে তারতম্য লক্ষ্য করে শঙ্কিত হন। সেখান থেকে মদীনায় ফিরে খলীফাকে বললেন, ‘আমি আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের লোকদের দেখেছি, তারা ঠিকভাবে কুরআন পড়তে জানেনা। তাদের কাছে কুরআনের স্ট্যান্ডার্ড কপি পৌঁছাতে না পারলে ইহুদী ও নাসারার হাতে তাওরাত ও ইনজীলের যে দশা হয়েছে, এ উম্মতের হাতে কুরআনের দশাও অনুরূপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।’ খলীফা বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে আবু বকর (রা.) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ‘মাসহাফ’ এনে তার হুবহু নকল করে বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করেন। এভাবে কুরআনের হিফাজতের ব্যাপারে হুজাইফা (রা.) অবদান রাখেন। (সহীহ বুখারী)

উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ ও গুণাবলীর কারণে উমার (রা.) তাঁকে খুব সম্মান করতেন। যেহেতু হুজাইফা (রা.) রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছ থেকে মুনাফিকদের নাম জেনেছিলেন, খলীফা উমার (রা.)-এর সময়ে কোন মুসলিম মারা গেলে এ কথা খোজ করতেন যে, হুজাইফা কি এর জানাজায় শরীক হয়েছে? হুজাইফা গেলে তিনিও পড়তেন। আর হুজাইফা না গেলে তিনিও তার জানাজা পড়তেন না। (ইছাবা)

একবার উমার (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা আমার কর্মকর্তাদের মধ্যে কি কোন মুনাফিক আছে? হুজাইফা বললেনঃ একজন আছে। খলীফা বললেনঃ আমাকে তার একটু পরিচয় দাও। বললেনঃ আমি তা দেব না। হুজাইফা বলেনঃ তবে অল্প কিছু দিনের মধ্যে উমার তাকে বরখাস্ত করেন। সম্ভবতঃ তিনি সঠিক হিদায়াত পেয়েছিলেন। (সুওয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবা- ৪/১৩৬-১৩৭)

হুজাইফা (রা.) বলেনঃ আমি একদিন মসজিদে বসে আছি। উমার (রা.) আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেনঃ হুজাইফা, অমুক মারা গেছে, তার জানাজায় চল। একথা বলে তিনি চলে গেলেন। মসজিদ থেকে বের হতে যাবেন, এমন সময় পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন, আমি নিজ স্থানে বসে আছি। তিনি বুঝতে পেরে আমার কাছে ফিরে এসে বললেনঃ হুজাইফা, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, সত্যি করে বল আমিও কি তাদের (মুনাফিকদের) একজন? আমি বললামঃ নিশ্চয়ই না। আপনার পরে আর কাউকে কখনো আমি এমন সনদ দেব না। (ইবন আসাকির- ১/৯৭)

একবার উমার (রা.) তাঁর পাশে বসা সাহাবীদের বললেন, আচ্ছা আপনারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইচ্ছার কথা বলুন! প্রায় সকলেই বললেন, আমাদের একান্ত ইচ্ছা এই যে, আমরা যদি ধন-রত্নে ভরা একটি ঘর পেতাম, আর তার সবই আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতে পারতাম। সবার শেষে উমার (রা.) বললেন, আমার বাসনা এই যে, আমি যদি আবু উবাইদাহ, মুয়াজ ও হুজাইফার (রা.) মত মানুষ বেশী বেশী পেতাম, আর তাদের ওপর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অর্পণ করতে পারতাম। একথা বলে তিনি দীনারভর্তি একটি থলে একজন লোকের হাতে দিয়ে বলেন, এগুলি হুজাইফার কাছ নিয়ে যাও, আর তাকে বল, খলীফা এগুলি আপনার দরকারে খরচের জন্য পাঠিয়েছেন। তাকে আরো বলে দেন, তুমি একটু অপেক্ষা করে দেখে আসবে, সে দীনারগুলি কী করে। লোকটি থলেটি নিয়ে হুজাইফার কাছ গেল। আর হুজাইফা সাথে সাথে তা মিসকীনের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (ইবন আসাকির- ১/৯৯, ১০০)

হুজায়ফা (রা.) বলেন, লোকেরা রসুল (স.)-কে কল্যাণের বিষয়াদি জিজ্ঞাসা করত। কিন্তু আমি তাকে অকল্যাণের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম এ ভয়ে যে, অকল্যাণ আমাকে না ধরে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমরা জাহিলিয়ত ও অকল্যাণের মাঝে ছিলাম। এরপর আল্লাহ আমাদেরকে এ কল্যাণের মধ্যে আনলেন। এ কল্যাণের পর আবারও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যা। আমি বললাম, সে অকল্যাণের পর আবার কি কোন কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যা। তবে এর মধ্যে কিছুটা ধূম্র থাকবে। আমি বললাম, এর ধূম্র কেমন? তিনি বললেন, এক কওম আমার হেদায়েত ছেড়ে অন্য পথ এখতিয়ার করবে। তাদের থেকে ভাল কাজও দেখবে এবং মন্দ কাজও দেখবে। আমি বললাম, সে কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যা। জাহান্নামের দিকে দাওয়াতকারী এক দল হবে। যে তাদের দাওয়াতে জওয়াব দেবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! তাদের সীফত আমাদেরকে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তারা আমাদের লোকই এবং আমাদের ভাষায়ই কথা বলবে। আমি বললাম, যদি এমন হাল আমাকে পায়, তাহলে কি করতে নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, মুসলিমদের জামাআত ও ইমামকে আকড়ে থাকবে। আমি বললাম, যদি তখন মুসলিমদের কোন জামাআত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তখন সকল দল ত্যাগ করে সম্ভব হলে কোন গাছের শিকড় কামড়িয়ে পড়ে থাকবে, যবতক না তোমার মৃত্যু হয়। (বুখারী, মুসলিম)

তিনি পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি ছিলেন দারুণ উদাসীন। এ ব্যাপারে তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, মাদায়েনের ওয়ালী থাকাকালেও তাঁর জীবন যাপনে কোন পরিবর্তন হয়নি। অনারব পরিবেশ এবং সেইসাথে ইমারতের পদে অধিষ্ঠিত থাকা- এত কিছু সত্ত্বেও তাঁর কোন সরঞ্জাম ছিল না। বাহনের জন্য সব সময় একটি গাধা ব্যবহার করতেন। এমন কি জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম খাবার ছাড়া কাছে আর কিছুই রাখতেন না। (উসুদুল গাবা- ১/৩৯২) তবে তিনি দুনিয়া ও আখিরাত সমানভাবে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম নয় যারা আখিরাতের জন্য দুনিয়া ত্যাগ করেছে, আবার তারাও নয় যারা দুনিয়ার জন্য আখিরাত ছেড়ে দিয়েছে। বরং যারা এখান থেকে কিছু এবং ওখান থেকে কিছু নেয় তারাই মূলতঃ সবচেয়ে ভালো। (রিজালুন হাওলার রসূল ২০০)

হুজাইফাহ (রা.) বলেনঃ আমার স্মরণ আছে যে, একদা আমি ও নবী (স.)-এর এক সাথে চলছিলাম। তিনি দেয়ালের পিছনে মহল্লার একটি আবর্জনা ফেলার জায়গায় এলেন। অতঃপর তোমাদের কেউ যেভাবে দাঁড়ায় সে ভাবে দাঁড়িয়ে তিনি পেশাব করলেন। এ সময় আমি তাঁর নিকট হতে সরে যাচ্ছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে ইঙ্গিত করলেন। আমি এসে তাঁর পেশাব করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে রইলাম। (বুখারী ২২৫)

# ****উকাশা ইবন মিহসান (রা.)****

উককাশা ইবন মিহসান ইবন হুরসান জাহিলী যুগে বনু আবদে শামসের হালীফ বা চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। হিজরতের আগেই ইসলাম কবুল করেন এবং অন্যদের সাথে মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যান। (উসুদুল গাবা-৪/২)

রসূল (স.) একবার বলেন, সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। উকাশা প্রশ্ন করেন, হে রসুল, আমি? বললেন, তুমিও তাদের মধ্যে। এরপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তখন রসূল (স.) বললেন, উকাশা তোমার থেকে এগিয়ে গেছে। (???) [[2]](#footnote-2)

বদর যুদ্ধে সাহসিকতা সাথে যুদ্ধ করেন। [[3]](#footnote-3) উহুদ, খন্দকসহ সকল প্রসিদ্ধ যুদ্ধে শরীক হয়ে তিনি বেশ বাহাদুরি ও সাহসিকতা দেখান। হিজরী সপ্তম সনের রবীউল আউয়াল মাসে বনু আসাদের মুলোৎপাটনের জন্য তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। মদীনার পথে ‘গামার’ কূপের আশে পাশে ছিল এই বনু আসাদের বসতি। তিনি চল্লিশ জনের একটি বাহিনী নিয়ে দ্রুত সেখানে গিয়ে ‍হাজির হন। কিন্তু বনু আসাদের লোকেরা ভয়ে আগে ভাগেই সে জায়গা ত্যাগ করে অন্যত্র পালিয়ে যায়। উকাশা কাউকে না পেয়ে তাদের পরিত্যক্ত দুশো উট ও কিছু বকরী হাকিয়ে নিয়ে মদীনায় ফিরে ‍আসেন।

হিজরী ১২ সনে খলীফা আবু বকর (রা.) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে ভন্ডনবী তুলাইহা আসাদীর বিদ্রোহ নির্মূলের নির্দেশ দেন। উকাশা ও ছাবিত ইবন আরকাম ছিলেন খালিদের বাহিনীর দুজন অগ্র সৈনিক। তারা বাহিনীর আগে আগে চলছিলেন। হঠাত দুশমন সৈন্যর সাথে ‍তাদের সংঘর্ষ ঘটে। এই দুশমন সৈনিকদের মধ্যে তুলাইহা নিজে ও তাঁর ভাই সালামাও ছিল। তুলাইহা হামলা করে উকাশাকে, আর সালামা ঝাপিয়ে পড়ে সাবিতের ওপর। ছাবিত শাহাদত বরণ করেন। এমন সময় তুলাইহা চেচিয়ে ওঠে সালামা শিগগির আমাকে সাহায্য কর। আমাকে মেরে ফেলল। সালামার কাজ তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে তুলাইহার সাহায্যে এগিয়ে যায় এবং দুই ভাই এক সাথে উকাশাকে হামলা করে ধরাশায়ী করে। এভাবে উকাশা শহীদ হন।

ইসলামী ফৌজ এই দুই শহীদের লাশের কাছে পৌঁছে ভীষণ শোকাতুর হয়ে পড়ে। উকাশার দেহে মারাত্মক যখমের চিহ্ন ছিল। তার সারা দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। বাহিনী প্রধান খালিদ ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বাহিনীর যাত্রা বিরতির নির্দেশ দেন। এরপর শহীদ দু য়ের রক্তভেজা কাপড়েই দাফন দিয়ে সেই মরুভূমির বালুতে দাফন করেন।

**বিলাল বিন রাবাহ**

বিলাল হাবশী বংশোদ্ভূত ক্রীতদাস। তার পিতা রাবাহ এবং মাতা হামামাহ। তবে মক্কায় জন্মলাভ করেছিলেন। বনু জুমাহ ছিল তাদের মনিব।

অল্প কিছু লোক দাওয়াতে হক কবুল করলেও যে সাত ব্যক্তি প্রকাশ্য ঘোষণার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এ হাবশী গোলাম অন্যতম। বিলালের সামাজিক অবস্থানের কারণে তাঁর ওপর অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে। শাস্তি ও যন্ত্রণার নানা রকম অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁর সবর ও ইসতিকলালের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। গলায় উত্তপ্ত বালু, পাথরকুচি ও জ্বলন্ত কয়লার ওপর তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে, গলায় রশি বেঁধে ছাগলের মত শিশুরা মক্কার অলিতে গলিতে টেনে নিয়ে বেড়িয়েছে। আবু জাহল তাঁকে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে পিঠের ওপর পাথরের বড় চাক্কি রেখে দিত। মধ্যাহ্ন সূর্যের খরতাপে তিনি যখন অস্থির হয়ে পড়তেন, আবু জাহল বলত, ‘বিলাল, এখনো মুহাম্মাদের আল্লাহ থেকে ফিরে এসো।’ কিন্তু তখনো তার মুখ থেকে ‘আহাদ’ ‘আহাদ’ ধ্বনি বের হতো। অত্যাচারী মুশরিকদের মধ্যে উমাইয়্যা ইবন খালাফ ছিল সর্বাধিক উৎসাহী। সে শাস্তি ও যন্ত্রণার নিত্য নতুন কলা-কৌশল প্রয়োগ করত। কখনো গরুর কাঁচা চামড়ায় তাঁকে ভরে, কখনো লোহার বর্ম পরিয়ে উত্তপ্ত রোগে বসিয়ে দিয়ে বলত, ‘তোমার আল্লাহ লাত ও উয্‌যাহ’ কিন্তু তখনো এ তাওহীদ প্রেমিক লোকটির যবান থেকে ‘আহাদ’ ‘আহাদ’ ছাড়া আর কোন বাক্য বের হতো না।

একদিন বিলালের ওপর ‘বাতহা’ উপত্যকায় অত্যাচার চলছিল। ঘটনাক্রমে আবু বকর (রা.) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দারুণ মর্মাহত হলেন। মোটা অংকের অর্থ বিলালের মনিবকে দিয়ে তিনি তাঁকে আযাদ করেন।

মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় তিনি সাদ ইবন খুসাইমা রা.-এর অতিথি হলেন।

হিজরাতের আগ পর্যন্ত মক্কায় ইসলাম ছিল দুর্বল, হিজরতের পর মদীনায় তা সবল হয়ে দাঁড়ায়। এই মাদানী জীবনের সূচনা থেকে ইসলামী আচার-আচরণ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মুল ভিত্তির স্থাপনা শুরু হয়। মসজিদ প্রতিষ্ঠা, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং সালাতের জন্য আযানের প্রচলন হলো। বিলাল প্রথম ব্যক্তি, আযানের দায়িত্ব যাঁর ওপর অর্পিত হয়। কোনদিন বিলাল মদীনায় উপস্থিত না থাকলে ইবন উম্মে মাকতুম রা. তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন। বিলাল রা. সাধারণতঃ সুবহে সাদিক হওয়ার আগেই ফজরের আজান দিতেন। এ কারণে সকালে দু’বার আজান দেওয়া হতো। শেষের আজান দিতেন আমর ইবন উম্মে মাকতুম রা.। এ জন্য রমজান মাসে বিলালের আজানের পর পানাহার জায়েয ছিল।

রসূল (স.)-এর মদীনায় অবস্থান বা সফরের সময়, উভয় অবস্থায় বিলাল ছিলেন তাঁর বিশেষ মুয়াজ্জিন। একবার রসূল (স.)-এর কোন এক সফরে পথ চলতে চলতে রাত হয়ে গেল। সাহাবাদের কেউ কেউ আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, এখানে কোথাও রাত্রি যাপনের জন্য তাঁবু গাড়ার হুকুম দিলে ভালো হতো। রসূল স. বললেনঃ ‘আমার ভয় হচ্ছে ঘুম তোমাদের সালাত থেকে উদাসীন করে না দেয়।’ বিলাল সকলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব নিলেন। রসূল (স.)-এর অনুমতি পেয়ে সবাই তাঁবু গেড়ে বিশ্রামে গা এলিয়ে দিলেন। এদিকে বিলাল রা. অধিক সতর্কতার সাথে হাওদার কাঠের সাথে হেলান দিয়ে সুবহে সাদিকের প্রতীক্ষায় থাকলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে এ অবস্থায় তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে এলো এবং গভীর ঘুমে এমন অচেতন হয়ে পড়লেন যে সূর্যোদয়ের আগে আর চেতনা ফিরে এলো না। রসূলুল্লাহ সা. ঘুম থেকে জেগে সর্বপ্রথম বিলালকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার দায়িত্ব পালনের কি হলো? বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আজ আমি এমনভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে, এমনটি আমার সাধারণতঃ হয় না। রসূল সা. বললেনঃ ‘আল্লাহ যখন ইচ্ছা তোমাদের রূহ অধিকার করে নেন, আবার যখন ইচ্ছা তা ফিরিয়ে দেন। উঠে আজান দাও এবং লোকদের নামাযের জন্য সমবেত কর।’

বিলাল রা. প্রধান প্রধান সকল যুদ্ধেই শরীক ছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি উমাইয়্যা ইবন খালাফকে হত্যা করেন। মক্কায় যাঁরা বিলালেরও ওপর নির্যাতন চালাত, এ উমাইয়া ছিল তাদের অন্যতম। মক্কা বিজয়ের দিনে তিনি রসূল (স.)-এর সংগী ছিলেন। রসূল (স.)-এর সাথে তিনিও কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করেন। রসূল (স.)-এর নির্দেশে কাবার ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি আজান ধ্বনি উচ্চারণ করেন।

বিলাল (রা.) আবূ বকর (রাঃ) কে বললেন, আপনি যদি আপনার ব্যক্তিগত কাজের জন্য আমাকে ক্রয় করে থাকেন তবে আপনার খেদমতেই আমাকে রাখুন আর যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের (আযাদ করার) আশায় আমাকে ক্রয় করে থাকেন, তাহলে আমাকে আল্লাহর ইবাদত করার সুযোগ দান করুন। (বুখারী 3800)

আবু বকর (রা.) বললেনঃ ‘বিলাল, ‍তুমি আমার থেকে দূরে চলে গিয়ে বিচ্ছেদ বেদনায় আমাকে কাতর করে তুলো না।’ আবু বকরের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁর জীবদ্দশায় বিলাল কোন যুদ্ধে শরীক হননি।

বিলাল আবু বকরের পর খলীফা উমারর কাছেও অনুমতি চাইলেন জিহাদে অংশগ্রহণের। খলীফা তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর অত্যধিক উৎসাহ দেখে খলীফা উমার তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তিনি সিরিয়া অভিযানে অংশগ্রহণ করলেন। ১৬ হিজরী সনে উমারের সিরিয়া সফরকালে অন্যদের সাথে বিলালও ‘জাবিয়া’ নামক স্থানে খলীফাকে স্বাগত জানান এবং ‘বাইতুল মুকাদ্দাস’ সফরে তিনি খলীফার সংগী হন। সফরের এক পর্যায়ে একদিন খলীফা বিলালকে অনুরোধ করলেন আজান দেওয়ার জন্য। বিলাল বললেনঃ ‘যদিও আমি অঙ্গীকার করেছি, রসূল (স.)-এর পর আর কারো জন্য আজান দিব না, তবে আজ আপনার ইচ্ছা পূরণ পূরণ করবো।’ এ কথা বলে তিনি এমন হৃদয়গ্রাহী আওয়াযে আজান দিলেন যে উপস্থিত জনতার মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিল। উমার এত কাঁদলেন যে তাঁর বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবু উবাইদা ও মুয়ায বিন জাবাল রা. কান্নায় ভেংগে পড়েছিলেন। সবারই মনে তখন নবী-যুগের ছবি ভেসে উঠছিল, অন্তরে তখন এক বিশেষ অনুভূতি জেগে উঠেছিল।

সিরিয়ার সবুজ ও শস্য-শ্যামল ভূমি বিলালের খুবই ভালো লাগে। তিনি খলীফার কাছে তাঁর ইসলামী ভাই আবু রুওয়াইহাসহ তাঁকে সিরিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দানের জন্য আবেদন জানান। তাঁর আবেদন মঞ্জুর হয়। তাঁরা দু’জন ‘খাওলান’ নামক ছোট একটি শহরে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের পূর্বেই এ শহরে বসতি স্থাপন করেছিলেন সাহাবী আবু দারদা আনসারীর রা. গোত্র। এখানে তাঁরা দু’জন এ গোত্রের দু’টি মেয়েকে বিয়ে করে তাদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন।

দীর্ঘদিন যাবত বিলাল রা. সিরিয়ায় বাস করতে থাকেন। একদিন স্বপ্নে দেখলেনঃ রসূল স. বলছেনঃ ‘বিলাল, এমন নিরস জীবন আর কতকাল? আমার যিয়ারতের সময় কি তোমার এখনো হয়নি?’ এ স্বপ্ন তাঁর প্রেম ও ভালোবাসার ক্ষত আবার তাজা করে দিল। তখুনি তিনি মদীনা রওয়ানা হলেন এবং রওজা মুবারকে হাজির হয়ে জবাই করা মোরগের মত ছটফট করতে লাগলেন। হাসান ও হুসাইনকে রা. জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকেন। তাঁরা দু’জন সে দিন সকালে ফজরের আজান দেওয়ার জন্য বিলাল রা. কে অনুরোধ করেন। তাঁদের অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। সুবহে সাদিকের সময় মসজিদে নববীর ছাদে দাঁড়িয়ে তিনি ‘আল্লাহু আকবর’ বলছিলেন, আর সে ধ্বনি মদীনার অলিতে গলিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছিল। তাঁর সে আজান শুনে মদীনার জনগণ তাকবীর ধ্বনি দিয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলছিল। তিনি যখন ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলাল্লাহ’ বললেন, তখন মদীনার নারী-পুরুষ সকলের অস্থিরভাবে কাঁদতে কাদতে ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদের দিকে দৌড়াতে শুরু করেন। বর্ণিত আছে, এমন ভাব-বিহ্বল দৃশ্য মদীনায় আর কখনো দেখা যায়নি।

হিজরী ২০ সনে প্রায় ষাট বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। দিমাশকের ‘বাবুস সাগীরের’ কাছেই তাঁকে দাফন করা হয়।

চারিত্রিক সৌন্দর্য বিলাল রা.-এর মর্যাদা ও সম্মানকে অত্যধিক বাড়িয়ে দিয়েছিল।

উমার বলতেনঃ ‘আবু বকর আমাদের নেতা (সায়্যিদ) এবং তিনি আমাদের নেতা বিলালকে আজাদ করেছেন।’ (বুখারী)

রসূল (স.)-এর সাহচর্য ও সেবাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সব সময় রসূল (স.)-এর পাশে থাকতেন। রসূল (স.)-এর সফরসংগী হতেন। ঈদ ও ইসতিসকার সালাতের সময় বল্লম হাতে রসূল (স.)-এর আগে আগে ময়দানে যেতেন। শত প্রয়োজন ও দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও হাতে কিছু এলেই তার একাংশ রসূল সা-কে উপঢৌকন পাঠাতেন।

একবার উৎকৃষ্ট মানের কিছু খেজুর রসূল (স.)-এর কাছে নিয়ে আসেন। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ ‘বিলাল, এগুলি কোথায় পেলে? জবাব দিলেনঃ আমার কাছে কিছু নিম্নমানের খেজুর ছিল। যেহেতু আপনার খিদমতে কিছু পাঠানোর ইচ্ছা ছিল, এ জন্যই দু’ সা’য়ের বিনিময়ে এর এক সা’ খেজুর লাভ করেছি। রসূল স. বললেনঃ ‘হায়, হায়, এমন করোনা। এ তো এক ধরণের সুদ। যদি তোমাকে খরীদ করতেই হতো, তাহলে প্রথমে তোমার খেজুরগুলি বিক্রি করে দিতে এবং সেই অর্থ দিয়ে এগুলি খরীদ করতে।

মক্কায় যে অত্যাচার বিলাল সহ্য করেছিলেন, তা দ্বারাই তাঁর সহ্যশক্তি, ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। কেউ তাঁর কোন গুণের কথা বললে বলতেনঃ ‘আমি তো শুধু একজন হাবশী, কাল পর্যন্তও যে দাস ছিল।’ সততা, নিষ্কলুষতা ও বিশ্বস্ততা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সম্ভ্রান্ত আরব পরিবারে তিনি একাধিক বিয়ে করেছিলেন। আবু বকরের কন্যার সাথে রসূল স. নিজে বিয়ে দিয়েছিলেন। বনু যুহরা ও আবু দারদার পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু কোন পক্ষেই তাঁর কোন সন্তান জন্ম লাভ করেনি।

একদিন রসূল স. বিলালকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেনঃ বিলাল, কিসের বদৌলতে তুমি আমার আগেই জান্নাতে পৌঁছে গেলে? গতরাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করে তোমার ‘খশ্‌খশা’ আওয়ায শুনতে পেলাম।’ বিলাল বললেনঃ ‘হে রসূলাল্লাহ, আমি কোন গুনাহ করলেই দু’ রাকায়াত সালাত পড়ি। আর অজু চলে গেলে তখনি আবার অজু করে আমি দু’ রাকায়াত সালাত আদায় করে থাকি।’ (বুখারীi)

বিলাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর চামড়ার মোজাদ্বয় ও পাগড়ির উপর মাসহ করেছেন। (মুসলিম 275)

বিলাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কাবার অভ্যন্তরে রাসূলুল্লাহ (স.) সালাত আদায় করেছেন। (তিরমিজী 874)

#  **শুকরান সালেহ (রা.)**

নাম সালেহ, লকব শুকরান। পিতার নাম আদী। আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা.)-এর হাবশী বংশজাত দাস। তবে এই দাসত্বের মধ্যেও নেতৃত্বদান তার ভাগ্যে ছিল। রসূল (স.) নিজের কাজের জন্য তাকে নির্বাচন করেন। অর্থের বিনিময়ে তাকে আবদুর রহমানের কাছে থেকে খরীদ করেন। কোন কোন বর্ণনা মতে আবদুর রহমান কোন রকম অর্থ বিনিময় ছাড়াই তাকে রসূল (স.)-এর অনুকূলে হিবা করেন।

অধিকাংশ যুদ্ধে শুকরান যুদ্ধলদ্ধ সম্পদ ও কয়েদীদের হিফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত হতেন। এ কারণে যুদ্ধে তিনি একদিকে গনীমাতের অংশ পেতেন, আবার অন্যদিকে যাদের কয়েদীদের দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করতেন তাদের কাছে থেকে পারিশ্রমিক পেতেন। আবু মাশার বলেন, তিনি দাস হিসাবে বদর যুদ্ধে যোগ দেন। এ কারণে গনীমতের অংশ তাকে দেওয়া হয়নি। তবে বদরে বন্দীদের দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রত্যেকেই কিছু কিছু অর্থ তাকে দান করে। এতে যারা গানীমতের হিস্যা পেয়েছিলেন তাদের থেকেও তিনি বেশি পেয়ে যান। বদর যুদ্ধে তার দায়িত্ব পালনে সতর্কতা ও দক্ষতা দেখে রসূল (স.) এতই মুগ্ধ হন যে, তাকে আজাদ করেন।

‘মাররে ইয়াসী’ যুদ্ধে পরাজিত দুশমন বাহিনীর পরিত্যাক্ত অর্থ সম্পদ অস্ত্র-শস্ত্র, ছাগল-বকরী ও তাদের অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী জমা করার দায়িত্বে তাঁকে নিয়োজিত করা হয়। রসূল (স.) তার প্রতি এত সন্তুষ্ট ছিলেন যে, ইন্তিকালের সময় তার প্রতি সদাচরণের জন্য অসীয়ত করে যান। শুকরান (রা.) রসূল (স.)এর পরিবারবর্গের সাথে রসূল (স.)-এর দাফন-কাফনে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ইবন ইসহাক আলী ইবনুল হুসাইনের সূত্রে বর্ণনা করেন, আলী ইবন আবী তালিব, ফজল ইবন আব্বাছ, কুছাম ইবন আব্বাছ, শুকরান মাওলা রসুল ও আওস ইবন খাওলা কবরে নেমে রসূলকে কবরে শায়িত করেন। (ইবনে হিশাম ২/৬৬৪)

রসুলর (স.) ইন্তিকালের পর শুকরান (রা.) মদীনায় থাকেন না বসরায় বসতি স্থাপন করেন- এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। কারণ, বসরায় তার একটি বাড়ী ছিল। তার মৃত্যুর সন ও জায়গা সম্পর্কেও সঠিকভাবে জানা যায় না। ইতিহাসে তিনি শুকরান মাওলা রসুলিল্লাহ [রসূলের আজাদকৃত দাস শুকরান] নামে প্রসিদ্ধ।

আবু রাফি

আবু রাফি আসলাম (জন্ম: মক্কা, মৃত্যু: 40হি/660 ইং কুফা) আগে আব্বাছ (রা.)-এর দাস ছিলেন। আব্বাছ রসুল (স.)-কে হিবা করেন। আব্বাছ (রা.)-এর ইসলাম কবুলের খুশীতে রসূল (স.) আবু রাফেকে আজাদ করে দেন।

আবূ রাফি (রা.) বলেনঃ কুরায়শরা আমাকে রসূলূল্লাহ্ (স)-এর কাছে পাঠায়। আল্লাহর রসূল (স)-কে দেখার সাথে সাথেই আমার অন্তরে ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তখন আমি বলিঃ হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম! আমি কখনই তাদের কাছে ফিরে যাব না। তখন আল্লাহর রসূল (স) বলেনঃ আমি ওয়াদা খিলাফ করব না এবং দূতকে বন্দী করব না; বরং তুমি ফিরে যাও। অবশ্য সেখানে ফিরে যাওয়ার পর তোমার অন্তরে যদি এরূপ খেয়াল অবশিষ্ট থাকে, যা এখন আছে, তাহলে তুমি ফিরে এসো। আবূ রাফি (রা.) বলেনঃ তখন আমি ফিরে যাই এবং পরে নবী (স.) এর কাছে এসে ইসলাম কবুল করি। (আবু দাউদ 2758)

আবু রাফে অত্যাচারী কুরাইশ শক্তির ভয়ে বদর যুদ্ধ পর্যন্ত ইসলাম কবুলের কথা গোপন রাখেন। বদর যুদ্ধ সবে মাত্র শেষ হয়েছে এমন সময় একদিন তিনি কাবার পাশে জমজম কুয়োর ঘরে বসে তীর তৈরী করছেন। আব্বাছের বিবি তার পাশেই বসা। এ সময় পাপাচারী আবু লাহাব সেখানে এসে বসে। আবু লাহাব তার কাছে বদর যুদ্ধের অবস্থা জিজ্ঞেস করতে লাগল। উল্লেখ্য যে, আবু লাহাব বদর যুদ্ধে নিজে যোগদান না করে প্রতিনিধি হিসাবে আস ইবন হিশামকে পাঠায়। আবু লাহাবের জিজ্ঞাসার জওয়াবে আবু সুফিয়ান বলল: তুমি কি জিজ্ঞেস করছ, মুসলিমরা আমাদের সকল শক্তি চুরমার করে দিয়েছে, অনেককে হত্যা ও বহু লোককে বন্দী করেছে। এ প্রসঙ্গে এক কাহিনী বলা হয় যে, ভূমি থেকে আছমান পর্যন্ত ‍সাদা কালো পোশাকের অশ্বারোহীতে পরিপূর্ণ ছিল। তার এ কথা শুনে আবু রাফে অকস্মাৎ বলে ওঠেন, তারা ফিরিশতা। সঙ্গে সঙ্গে আবু ছুফিয়ান আবু রাফের গালে চপেট বসিয়ে দেয়। আবু রাফে আঘাতটা সামলে নিয়ে রুখে দাড়ান; কিন্তু তিনি ছিলেন দূর্বল। আবু লাহাব তাকে মাটিতে ফেলে দেয় এবং বুকের ‍উপর উঠে বসে আচ্ছামত মার দেয়। আব্বাছের বিবি এ অত্যাচার দেখে সহ্য করতে পারলেন না। তিনি একটি খুটি তুলে নিয়ে আবু লাহাবের মাথায় কষে মারলেন এক বাড়ি। আবু লাহাবের মাথা কেটে গেল। আব্বাছের বিবি তখন বলতে লাগলেন, আবু রাফের মনিবের অনুপস্থিতির সুযোগে তাকে দুর্বল মনে করে মারছ? এ ঘটনার এক সপ্তাহ পর বসন্ত রোগে আবু লাহাবের মৃত্যু হয়। (তাবাকাত ইবনে ছাদ)

আয়িশা রা: বলেছেন, রসুল (স.) মদীনায় হিজরতের কিছুদিন পর একটু স্থির হয়ে আমাদেরকে নেওয়ার জন্য জায়িদ ইবন হারিছা ও আবু রাফিকে মদীনা থেকে মক্কায় পাঠান। (ইবন হিশাম)

আবু রাফি (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (স) এক ব্যক্তির কাছ হতে একটি তরুণ উট ধার নিয়েছিলেন। এরপর যখন তাঁর কাছে সদকার উট এল তখন তিনি আবু রাফেকে ঐ লোকটির তরুণ উট পরিশোধ করতে আদেশ করলেন। আবু রাফে তাঁর কাছে এসে বললেন, ‘সপ্তবর্ষীয় বাছাই করা ভালো ভালো উট ছাড়া অন্য কিছু পেলাম না।’ নবী (স.) বললেন, ‘‘ঐটিই ওকে দিয়ে দাও। কারণ, লোকেদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যে পরিশোধ করায় উত্তম।’’ (মুসলিম ৪১৯২)

আবু রাফি বর্ণনা করেন: (খাইবারে) আলী কেল্লার গেটের একটি পাল্লা ছিড়ে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন। যুদ্ধের শেষ তক সেটা তার হাতে ছিল। তারপর ফেলে দেন। আমি সাতজনকে সাথে নিয়েও সেটা উল্টাতে পারিনি। (ইবন হিশাম)

আবু রাফি সালমাকে বিয়ে করেন যিনি উম্মে রাফি নামে পরিচিত। শিশু: উবাইদুল্লাহ বিন আবি রফি, মুগীরা বিন আবি রফি, আলী বিন আবি রফি, ফাদল ইবনে আবী রফি, হাসান বিন আবি রফি, রফি বিন আবি রফি, জয়নব বিনতে আবি রাফি.

আবু রাফি বলেন, রসূল (স) বিয়ের সময় হালাল অবস্থায় বিয়ে করেন (ইহরাম অবস্থান ছিলেন না) হালাল অবস্থায় বাসর করেন আর আমি ছিলাম দূত । (দারেমী .....)

রসূল (স) আলী (রা.)-এর নেতৃত্বে যে বাহিনীটি ইয়ামনে পাঠান তাতে আবু রাফেও ছিলেন। আলী (রা.) নিজের অনুপস্থিতিতে আবু রাফিকে বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন।

রসুলুল্লাহ (স.) তাকে আজাদ করে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেই রসুল (স.)-এর খিদমতে আবদ্ধ থাকেন। রসূল (স.) যখন তাকে মুক্তি দেন, তখন আবু রাফের দু চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। লোকেরা তাকে বলে, দাসত্ব থেকে মুক্তি পাচ্ছ, এতে কান্নার কি আছে! তিনি বললেন, আজ একটি সোয়াব আমার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এরপর থেকে যদিও তিনি আইনগত আজাদ হয়ে যান, তবে রসুল (স)-এর খিদমতের মর্যাদা ধরে থাকেন। সফরের সময় রসুল (স)-এর তার তাঁবু তিনিই তৈরী করতেন।

আবু রাফি (রা.) বলেন, নবী (স) এক ব্যক্তিকে (আরকাম) বনী মাখ্‌জুমদের কাছ থেকে জাকাত আদায়ের জন্য পাঠালেন। তিনি (আরকাম) আবু রাফেকে বলেন, আপনি আমার সংগে থাকুন তাহলে আপনিও তা হতে কিছু পাবেন। জওয়াবে তিনি বলেনঃ আমি নবী (স.)-এর কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব। তিনি রসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ কোন সম্প্রদায়ের মুক্তদাস তাদের অর্ন্তভূক্ত। অতএব আমাদের জন্য যাকাতের মাল বৈধ নয় (তাই তোমার জন্যও তা বৈধ নয়)। (আবু দাউদ ১৬৫০) রসুল (স.) তাকে নিজ পরিবারের মধ্যে শামিল করে নেন। এর বেশি খান্দানী শরাফত কোন মানুষের জন্য আর হতে পারে ‍না।

শিক্ষার্থী: ফাদল ইবনে আবু রাফি, হযরত হাসান ইবনে আবি রফি, রফি বিন আবি রফি, উবাইদুল্লাহ বিন আবি রফি', আল মুগীরা বিন আবি রফি, নাসরুল্লাহ, আলী বিন হুসাইন বিন আলী, কায়সন আবু সাঈদ মুক্বারি, সুলায়মান ইবনে যাসর, আতা ইবনে যাসর, আবু ঘাতফান, আমর ইবনে শরিদ, হুসাইন ওয়াল দাউদ, সাদ ইবনে আবী শাইদ মুল্লা, শারহাব বিন বিন'd

বর্ণনা: সহীহ বুখারী: 14, সহীহ মুসলিম ২0টি, সুনান আবি দাউদ 14, জামী তিরমিযী 9, সুনান নাসায়ী 11টি, সুনান ইবনে মাজাহ: 18 হাদীসের গ্রন্থসমূহে তার বর্ণিত ৬৮টি হাদীস পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি ইমাম বুখারী ও তিনটি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আবূ রাফি (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, সাদ (রা.) তার কাছ থেকে চারশ’ মিসকাল দিয়ে একটা ঘর খরিদ করার জন্য দর করেন। তখন তিনি বলেন, যদি আমি রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বলতে না শুনতাম যে, ‘‘প্রতিবেশী তার পার্শ্ববর্তী ভূমি কেনার ব্যাপারে অধিক হকদার’’ তাহলে তোমাকে আমি দিতাম না। (বুখারী 7064)

দাসত্ব থেকে মুক্তির পরও তিনি রসূল (স)-এর খিদমতের গৌরব হাতছাড়া করেননি। এ কারণে রসুল (স.)-এর রোজকার কাজ ও অভ্যাস সম্পর্কে তার জানা ছিল অনেক। বিশিষ্ট সাহাবীরা এ বিষয়ে তার কাছে জানার জন্য ভিড় করতেন। ইবন আব্বাছ (রা) একজন লেখক সংগে করে তার কাছে আসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, রসুল (স.) অমুক অমুক দিন কি কি কাজ করতেন? আবু রাফি বলতেন আর লেখক তা লিখে নিতেন। (ইছাবা-৪/৯২)

ছাওবান বিন বুজদুদ

ছাওবান বিন বুজদুদ (রা.) (জন্ম: সুরাত -ম: 54 হি/663ই হিমস) রসূল (স) এর ক্রীতদাস ছিলেন. তার পূর্বপুরুষ ইয়েমেন থেকে ছিল।

সাগরিদ: আমর বিন মারসাদ, আবু আসমা রাহবী, মাদান ইবনে আবু তালহা, শাদ্দাদ বিন হাই হিমছী, রশিদ ইবনে সাদ, জুবাইর বিন নুফাইর হাদরামী, আবদুর রহমান বিন গানাম, আবু আমির বিন গাবির, আবু ইদ্রিস খাওলানী

তিনি রসূল (স) সারা জীবন সঙ্গে থাকেন। তিনি সিরিয়ার হিমসে বাড়ি করেন।

বর্ণনা: সহীহ মুসলিম: 10 সুনান আবি দাউদ: 11টি, জামি তিরমিযি: 15 সুনান নাসাঈ: 2 সুনান ইবনে মাজাহ: 16

ছাওবান (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন রসুলুল্লাহ (স.) যখন তার সালাত শেষ করতেন, তখন তিনবার ইস্তিগফার করতেন এবং বলতেনঃ “হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময় এবং আপনার থেকেই শান্তি। আপনি বরকতময় হে মহিমান্বিত ও সম্মানিত”। (মুসলিম 1362)

ছাওবান (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে কেউ তাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। এমন কি এভাবে আল্লাহর আদেশ অর্থাৎ কিয়ামত এসে পড়বে আর তারা যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকবে। (মুসলিম 5059)

ছাওবান (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে আমার কাছে এই ওয়াদা করবে যে, সে অন্যের কাছে চাইবে না - আমি তার জান্নাতের জিম্মাদার হব। ছাওবান (রা.) বলেন, আমি। এরপর তিনি কারো কাছে কিছু চাইতেন না। (আবু দাউদ 1643)

ছাওবান (রা.) বলেনঃ রসূলুল্লাহ্‌ (স.) বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আমার জন্য জমীনকে সংকুচিত করে দেন। অথবা তিনি বলেনঃ মহান আল্লাহ্‌ যমীনকে আমার জন্য ছোত করে দেন। আর এ সময় আমাকে যমীনের পূর্ব ও পশ্চিম দিক দেখানো হয়। আমার উম্মতের হুকুমত অবশ্যই সে পর্যন্ত পৌঁছবে, যা আমাকে দেখানো হয়েছে। আর আমাকে দু’টি ধন-ভাণ্ডার দেওয়া হয়েছে, লাল এবং সাদা অর্থাৎ সোনা ও রূপা। আমি আমার মহান রবের কাছ এমন দুআ করি, তিনি যেন আমার উম্মতকে এক সাথে ধ্বংস না করেন এবং তাদের উপর এমন কোন দুশমনকে জয়ী না করেন, যে তাদের সমূলে ধ্বংস করবে। আমার রব আমাকে বলেনঃ হে মুহম্মদ! আমি যখন কোন হুকুম জারি করে, কখন তা রদ হয় না। তবে আমি তোমার উম্মতকে একই দুর্ভিক্ষের বছর এক সাথে ধ্বংস করব না এবং তাদের উপর এমন কোন দুশমনকে বিজয় দিব না, যে তাদের সমূলে ধ্বংস করবে; তবে তোমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি হবে, যারা একে অন্যকে ধ্বংস ও বন্দী করবে। তিনি (স.) আরো বলেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে মধ্যেকার গুমরাহ্‌কারী নেতাদের ব্যাপারে খুবই ভীত। যখন আমার উম্মতের লোকেরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তখন তা কিয়ামত পর্যন্ত নিরস্ত হবে না। আর কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মতের সমস্ত গোত্র মুশ্‌রিকদের সাথে মিলে যাবে এবং মূর্তিপূজায় লিপ্ত হবে। তিনি স. বলেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশ জন ভণ্ড নবীর আবির্ভাব ঘটবে, যাদের প্রত্যেকে নিজেকে নবী হিসাবে দাবী করবে। অথচ আমিই শেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী নেই। বস্তুত আমার উম্মতের এক জামাআত সব সময় সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদের বিরোধীপক্ষ তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ অর্থাৎ কিয়ামত এসে যাবে। (আবু দাউদ 4252)

54 হিজরীতে হিমসে মারা যান। (ইবনে ছাদ)

ছাফীনা মওলা উম্মে সালামা

মাহরান বিন ফারুক (জন্ম: মক্কা- মৃত্যু 70হি. মদিনা) উম্মে সালামা (রা.)-এর ক্রীতদাস ছিলেন। ছাফীনা খেতাব। ছাফীনা (রা.) বলেন, আমি উম্মে সালাম (রা.) এর ক্রীতদাস ছিলাম। তিনি বলেনঃ আমি তোমাকে এ শর্তে আজাদ করছি যে, তুমি আজীবন নবী (স)–এর খিদমত করবে। তখন আমি বলিঃ যদি আপনি এ শর্ত আরোপ নাও করেন, তবুও আমি যতদিন জীবিত থাকব রসূলুল্লাহ (স.)-এর খিদমত হতে বিরত থাকব না। পরে তিনি এ শর্তে আমাকে আজাদ করে দেন। (আব দাউদ: 3932)

ছাফীনা (রা.) বলেন, আমার নাম ছিল কায়েছ, রসূলুল্লাহ (স.) আমার নাম দেন ছাফীনা। বলা হল, কেন তোমার নাম ছাফীনা দেয়া হল। তিনি বলেন, তার সাহাবীদের সাখে আমরা যাচ্ছিলাম। তাদের মালমাত্তা তাদের কাছে ভারী হয়েছিল। আমাকে বলা হল, তোমার কাপড় বিছাও। আমি কাপড় বিছালাম। সেখানে সব মালমাত্তা রেখে বললেন, বহন কর কারণ তুমি আমাদের জন্য ছাফীনা (নৌকা)। ........(হাকিম 6607, আহমদ 21421)

সাগরেদ: উমর ইবনে ছাফীনা, আবদুর রহমান (ছেলে), সাঈদ ইবনে যামান, আবদুল্লাহ ইবনে মুসার, আবু রেহানা, সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ বিন উমর, আব্দুর রহমান ইবনে নাঈম, হাসান বছরী.

তার রেওয়ায়েত: সহীহ মুসলিম: ২ সুনান আবী দাউদ: 3 জামী তিরমিজী: ২ সুনান ইবনে মাজাহ: ২টি।

ছাফীনা (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, রসূলুল্লাহর সাহাবা আবূ বকর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ এক সা' পানি দিয়ে গোসল এবং এক মুদ পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন (ওজু) করতেন। (সহীহ মুসলিম 326)

ছাফীনা (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ নুবূওয়াতের খিলাফতের সময়কাল ত্রিশ বছর। এরপর আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা বাদশাহী দান করবেন। রাবী সাঈদ বলেনঃ ছাফীনা (রা.) আমাকে বলেনঃ তুমি হিসাব কর। আবূ বকর (রা.)-এর শাসনকাল দুই বছর; উমর (রা.)-এর দশ বছর; উছমান (রা.)-এর বার বছর এবং আলী (রা.)-এর অর্থাৎ ছয় বছর। রাবী সাঈদ বলেনঃ তখন আমি ছাফীনা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, বনূ-মারওয়ান ধারণা করে যে, আলী খলীফাদের অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি বলেনঃ বনূ-মারওয়ান মিথ্যা বলেছে। (আব দাউদ: 4646)

ছাফীনা (রা.) উম্মে সালামাহ (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন; রসূলুল্লাহ (স) মৃত্যু ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় বলছিলেনঃ ‘‘সালাত এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসী’’। বারবার একথা বলতে বলতে শেষে তাঁর জবান জড়িয়ে যায়। (ইবনে মাজাহ 1693)

ছাফীনা (রা.) বলেছেনঃ একবার তিনি রোমকদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে বন্দী হন তারপর সেখান থেকে পালিয়ে এসে জঙগলে ঢুকে পড়েন। এরপর নিজ সেনাবাহিনীর তালাশ করতে থাকেন। তবে পথ ভুলে গভীর জঙগলে ঢুকে পড়েন। একটি বাঘ ধেয়ে আসে। তিনি বলেন, হে বাঘ, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর গোলাম। আমি এই মুশকিলে আছি। একথা শুনে বাঘটি মাথা নিচু করে এবং আমার পাশে এসে গা ঘেষতে লাগল। তারপর সে পথ দেখিয়ে লম্বা পথ হেটে আমাকে সেনাদলের কাছে পৌছে দিল। বিদায়ের সময় সে হামহুম আওয়াজ করে আমাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল। (সিয়ারু আলামিন নুবালা)

জু-মিখবর

জু-মিখবর/জু মিখমার (জন্ম: অবিসিনিয়া) নাজাশীর ভাইয়ের ছেলে।.

সাগরিদ: ইয়াযীদ ইবনে সালিহ, জুবাইর ইবনে নূফাইর

বর্ণনা: সুনানে আবু দাউদ: 1টি, ইবনে মাজা 1টি।

জু-মিখবর হাবশী (নাজ্জাশীর ভ্রাতাষ্পুত্র) হতে বর্ণিত, যিনি নবীর খিদমত করতেন, পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনাপূর্বক বলেন, নবী (স.) সালাত পড়ার উদ্দেশ্যে ওজু করেন। এরপর তিনি বিলাল (রা.)-কে নির্দেশ দিলে তিনি আজান দেন। নবী (স) দাড়িয়ে শান্তভাবে দুই রাকাত ফজরের সুন্নাত সালাত পড়েন। এরপর বিলাল (রা.)-কে ইকামত দিতে বলেন। তিনি ইকামত দিলে নবী সাহাবীদের নিয়ে ধীরস্হিরভাবে ফজরের দুই রাকাত ফরজ সালাত পড়েন। (**আবু দাউদ** 445)

জুবাইর ইবনে নূফাইর বলেন, তুমি আমাদের সাথে জু মিখমারের কাছে চল। তিনি ছিলেন নবী (স.)-এর সাহাবী। আমিও তাদের দু’ জনের সাথে গেলাম। তিনি তাকে সন্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। জওয়াবে তিনি বলেন, আমি নবী (স.)-কে বলতে শুনেছিঃ অচিরেই রোমকরা আমাদের সাথে শান্তিচুক্তি করবে। এরপর তোমরা (তাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করবে এবং তোমরা ও তারা (পরস্পরের) দুশমন হবে। এরপর তোমরা জয়ী হবে এবং গনীমতের মাল লাভ করবে। তোমরা নিরাপদ থাকবে এবং (যুদ্ধ থেকে) ফিরে আসবে। এমনকি তোমরা সবুজ উচু জায়গায় অবতরণ করবে। তখন ক্রুশধারীদের মধ্যকার এক ব্যক্তি (ক্রুশ) উত্তোলন করে বলবে, ক্রুশ জয়ী হয়েছে। তখন এক মুসলিম গোস্যা হয়ে ক্রুশের কাছে গিয়ে তা চূর্ণ করবে। তখন রোমকরা সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং তাদের সকলে যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ হবে। (ইবনে মাজাহ ৪০৮৯)

জু-মিখবর হতে বর্ণিত, নবী (স.) বলেন, এই শাসন ছিল হিময়ারীদের (Homerite Kingdom), তাদের থেকে আল্লাহ সেটা নিয়ে কুরাইশকে দিয়েছেন আর অচিরেই এটা তাদের কাছে ফেরত যাবে। (আহমদ 16386)

# রুওয়াইফি বিন ছাবিত ছাকান আনসারী

রুওয়াইফি বিন ছাবিত মুয়াবিয়ার রাজত্বকালে 46 হিজরীতে ত্রিপোলির ওলী ছিলেন। তিনি 47 হিঃ ইফ্রিকিয়াতে ইসলাম প্রবর্তনে অবদান রাখেন। তিনি জেরবা যান ও কায়রোয়ান পৌঁছেন। কায়রোয়ান পত্তনের পর যেখানে তিনি মসজিদ কায়েম করেন যা আনসার মসজিদ বা সিদি রুওয়াইফি মসজিদ হিসাবে পরিচিত হয়, তারপর পূর্ব লিবিয়ায় Bayda (El Beida) এবং বার্কা (Cyrenaica) ফিরে আসেন। তিনি 56 হিঃ বার্কায় মারা যান।

হানাশ ছানানী বলেন, তিনি (রুওয়াইফি ইবন ছাবিত আনসারী রাঃ) আমাদের মধ্যে খুতবা প্রদানের সময় দন্ডায়মান হয়ে বলেন, রসূল (স) বলেন, যে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্য গণীমতের মাল বণ্টনের আগে বিক্রয় করা হালাল নয়। **(আবু দাউদ** ২১৫৫**)**

শায়বান ক্বিতবানী বলেন, মাসলামাহ্ ইবন মুখাল্লাদ (রা.) রুওয়াইফি ইবন সাবিত (রা.)-কে নিম্নভূমিতে কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। শায়বান বলেন, আমরা তাঁর সাথে (মিসরের) ‘কুমি শারীক’ থেকে ‘আলকামা’ পর্যন্ত অথবা ‘আলকামা’ থেকে ‘কুমি শারীক’ পর্যন্ত সফর করেছি। ‘আলকামা’ ছিল তাঁর গন্তব্যস্থল। ........................ রুওয়াইফি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বলেছেনঃ হে রুওয়াইফি! সম্ভবতঃ আমার পরেও তুমি দীর্ঘদিন জীবিত থাকবে। তুমি লোকদের জানিয়ে দিও, যে দাঁড়িতে গিরা দিবে, ঘোড়ার গলায় মালা পরাবে অথবা প্রাণীর বিষ্ঠা বা হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করবে, মুহম্মাদ তার দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত (**আবু দাউদ** ৩৬, নাছায়ী ৫০৮২)

রুওয়াইফি ইবন সাবিত আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ যে মুহম্মদের উপর দরূদ পড়বে এবং বলবে, আল্লাহুম্মা আনজিলহুল মাকআদাল মুকররাবা ইনদাকা য়াওমাল কিয়ামাত, তিার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হবে। (আহমদ 16648, এর রাবীদের মধ্যে ইবনে লাহিয়া সদুক তবে ভুল করতেন, আর ওয়াফা বিন শারীহ মকবুল রাবী, হাদীসটি হাসান নতুবা জঈফ।)

রুওয়াইফি ইবন সাবিত আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) খায়বরে বলেছেনঃ আমার কাছে খরব পৌছেছে যে তোমরা মিছকালকে অর্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশ বিনিময় কর। এটা ঠিক না, বরং মিছকালের বদলে মিছকাল এবং ওজনের বদলে ওজন। (তাবারানী, মুজাম কবীর 4479)

# রুওয়াইফি বিন ছাবিত Balawi

.. হিজরীতে বালী প্রতিনিধিদল মদীনাতে আসে।

ধনী বা গরীব যে কোন লোকের সাথে সদাচার সদকা (ইছাবা)

রুওয়াইফি মওলা নবী (স.)

রুওয়াইফি মওলা

**মাবুর কিবতী**

রসুলুল্লাহ (স.)কে মিসরের মুকাকিস হাদিয়া হিসাবে পাঠিয়েছিলেন।

আবু বকরা ছাকাফী

আবু বকরা নাফী বিন হারিছ (জন্ম: তাঈফ-মৃত্যু: 53 বসরাহ) তায়েফের বাশিন্দা। নবী (স.) আট হিজরী সনের শাওয়াল মাসে তায়িফ অবরোধ করেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, যেসব দাস বের হয়ে আমাদের কাছে আসবে তারা আজাদ হবে। তখন নাফী বিন হারিছ কেল্লার দেয়াল টপকে বেরিয়ে আসেন এবং মুসলিমদের মধ্যে শামিল হন। নয় হিজরীতে ছাকীফ প্রতিনিধি দল মদীনায় এসে আবু বকরাকে ফেরত চায়। তবে নবী (স) তাদের দাবি নাকচ করে দেন।

সাগরিদ: উবাইদুল্লাহ ইবনে আবী বাকরা, আব্দুর রহমান ইবনে আবু বাকরা, আব্দুল আযীজ ইবনে আবি বকর, মুসলিম বিন আবি বাকরা, কায়েস বিনতে আবি বকর, হাসান বাসরী, ইবনে সিরিন,

বর্ণনা: সহীহ বুখারী 41, সহীহ মুসলিম: 16, সুনান আবী দাউদ 16 জামী তিরমিজী: 13 সুনান নাছায়ী ২5, সুনান ইবনে মাজাহ: 1২টি।

আবূ বাকরা (রাঃ) বলেন, যখন রাসূল ()-এর কাছে এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যবাসী কিসরা তনয়াকে তাদের বাদশাহ মনোনীত করেছেন, তখন তিনি বললেন, কখনোই সে জাতি সফল হবে না যারা স্ত্রীলোককে তাদের প্রশাসক নির্বাচন করে। (সহীহ বুখারী 4425)

আবূ বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ () বলেছেন যে, সূর্য এবং চন্দ্র হল আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন সমূহের দুটি নিদর্শন, কারো মৃত্যু এবং কারো জন্মের জন্য তাদের গ্রহণ হয় না, এবং আল্লাহ তার বান্দাদের তাদের দ্বারা ... প্রদর্শন করে থাকেন। [সহীহ বুখারী ১০৪৮]

আবূ বাকরা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, নবী (স.) বলেন, সময় ও কাল আবর্তিত হয় নিজ চক্রে ও অবস্থায়। যেদিন থেকে আল্লাহ্ আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছেন। এক বছর বারো মাসে হয়ে থাকে। এর মধ্যে চার মাস সম্মানিত। তিনমাস পরপর আসে- যেমন যিলকদ, যিলহাজ্জ ও মুহররম এবং রজব মুদার যা জমাদিউল আখির ও শাবান মাসের মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে থাকে। (এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন) এটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই বেশি জানেন। এরপর তিনি চুপ থাকলেন। এমনকি আমরা ধারনা করলাম যে, হয়তো তিনি এ মাসের অন্য কোন নাম রাখবেন। (তারপর) তিনি বললেন, এ কি যিলহাজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কোন শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তারপর তিনি চুপ থাকলেন। আমরা ধারনা করলাম যে, হয়ত তিনি এ শহরের অন্য কোন নাম রাখবেন। তারপর তিনি বললেন, এটি কি (মক্কা) শহর নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এ দিনটি কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তারপর তিনি চুপ থাকলেন। এতে আমরা মনে করলাম যে, তিনি এ দিনটির অন্য কোন নামকরণ করবেন। তারপর তিনি বললেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ; (রাবী) মুহাম্মদ বলেন, আমার ধারনা যে, তিনি [রসূল] আরও বলেছিলেন, তোমাদের ইজ্জত তোমাদের উপর পবিত্র, যেমন পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, তোমাদের এই শহর ও তোমাদের এই মাস। তোমরা অচিরেই তোমাদের রবের সাথে মিলিত হবে। তখন তিনি তোমাদের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। খবরদার! তোমরা আমার ওফাতের পরে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ো না যে, একে অপরের গর্দান মারবে। শোন, তোমাদের হাজির ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আমার পয়গাম পৌঁছে দেবে। এটা বাস্তব যে, অনেক সময় যে প্রত্যক্ষভাবে শুনেছে তার থেকেও প্রচারকৃত ব্যক্তি বেশি হেফাজতকারী হয়ে থাকে। তারপর রসূল বললেন, জেনে রাখ, আমি কি (আল্লাহর বানী তোমাদের কাছে) পৌঁছিয়ে দিয়েছি? এভাবে দু’বার বললেন। (বুখারী)

**ওয়াইল বিন হুজর** **হাজরামি**

ওয়াইল বিন হুজর হাজরামি

বাচ্চা: আব্দুল জব্বার বিন ওয়াইল, আলকামা বিন ওয়াইল বিন হুজর

সাগরিদ: আব্দুল জাবের বিন ওয়াইল, আলকামা বিন ওয়াই বিন আব্দুর রহমান, হুজর বিন আব্দুল্লাহ হাজরামী, কুলাইব বিন শাহাব, আব্দুর রহমান বিন নামান ইয়াসবি.

বর্ণনা: সহীহ মুসলিম: 2টি, সুনান আবি দাউদ 9টি, জামী তিরমিজী: 5 সুনান নাসায়ী: 1২ সুনান ইবনে মাজাহ: 6টি।

ওয়াইল (রাঃ) বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে হাজির ছিলাম। এ সময়ে দু' ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে একটি ভূমি সম্পর্কে বিচার চাইল। একজন বলল, হে আল্লাহর রসুল! জাহিলি যুগে এ ব্যক্তি আমার ভূমি জবরদখল করে নিয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, বিচার প্রার্থনাকারী ছিল ইমরাউল কায়ছ ইবন আবিস কিনদী আর তার বিবাদী ছিল রাবীআ ইবন আবদান। রসুলুল্লাহ (স) বললেনঃ তোমার সাক্ষী পেশ কর। লোকটি বলল, আমার কোন সাক্ষী নাই। রসুলুল্লাহ (স) বললেনঃ তাহলে বিবাদী থেকে কছম নেয়া হবে। লোকটি বলল, তাহলে সে মিথ্যা কছম করে সম্পতি গ্রাস করে ফেলবে। রসুলুল্লাহ (স.) বললেনঃ তার কাছ থেকে তোমার এতটুকু প্রাপ্য। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর বাদী যখন শপথ করার জন্য তৈয়ার হলো, তখন রসুলুল্লাহ বললেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পতি গ্রাস করবে, সে আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, তিনি তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন। (মুসলিম 376)

ওয়ায়েল হাদরামী (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন তারিক ইবনে সুওয়াইদ (রা) ঔষধ হিছাবে মদের ব্যবহার বিষয়ে রসূলুল্লাহ (স.)-কে সওয়াল করলেন। তখন তিনি বলেন, “সেটা তো ঔষধ নয়; বরং তা ব্যাধি। (সহীহ মুসলিম ৫২৫৬)

ওয়াইল (রা.) বলেন, নবী (স) তাকে হাদরামাওত এলাকায় এক খন্ড জমি জায়গীর হসিাবে দয়িছেনে। (আবু দাউদ ৩০৫৮, তিরমিজী ১৪১২, দারমেী ২৬০৯)

ওয়ায়েল বিন হুজর (রা) বলেন, আমি নবী (স:) কে দেখলাম তিনি যখন সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকতেন তিনি তার ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর রেখে ধরতেন। (নাছায়ী সহীহ; আরও আহমদ, ইবনে আবু শায়বা, তাবারানীর মুজাম কবীর, ইয়াকুব ফাসাভীর মারফিাহ)

ওয়ায়েল (রা.) বলেন, “আমি নবী (স.) এর পিছে সালাত পড়েছি। যখন তিনি তাকবীর বললেন তখন তার দুই কানের নিচ পর্যন্ত দুই হাত তুললেন। যখন তিনি ওয়া লাদদ্বল্লীন বললেন তখন বললেন আমীন। আমি তার পিছে থেকে তা শুনলাম।” (নাছায়ী; হাসান। দারাকুতনী, হাকিম ও ইবনে হিব্বান আবু হুরায়রা থেকে সহীহ সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন নবী (স.) আমীন বলার সময় তার আওয়াজ উচু করতেন।)

**http://muslimscholars.info/manage2.php?submit=scholar&ID=34**

<http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=86&bookhad=1126>

**বুছাইছা বিন আমর বিন ছালাবা**

বুছাইছা বিন আমর বিন ছালাবা বিন খারাশা জুহানী খাজরাজ গোত্রের হালীফ ছিল।

আবূ ছুফিয়ানের সিরিয়া হতে আগমনকারী কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে প্রেরণ করেন..

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) বুছাইছা (রাঃ)-কে আবূ ছুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফিলার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে প্রেরণ করেন। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। তখন আমি ও রসুলুল্লাহ ছাড়া ঘরে আর কেউই ছিল না। রাবী বলেন, আমি স্মরণ করতে পারছি না, তিনি (আনাছ) নবী (স)-এর কোন বিবির (না থাকার) কথাও বলছেন কিনা। এরপর সে তার সঙ্গে কথা বলল। (মুসলিম 5024, সুনান বায়হাকী 18661)

(ل [بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان فجاء](http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=3520#docu) )

আনাস (রা) বলেন, নবী (স.) তাঁর সাহাবী বাছবাছাকে গুপ্তচর হিসেবে আবূ ছুফিয়ানের কাফেলার অবস্থা ও গতিবিধি অবলোকন করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। (আবু দাউদ ২৬১০)

আবু দাউদে নামটি বাছবাছা বলা হয়েছে।

**আবূ হুমাইদ সায়ীদী আনসারী**

আবূ হুমাইদ সায়ীদীর পূর্ণ নাম: আব্দুর রহমান/মুনজির বিন সাদ (জন্ম: মদিনা-মৃত্যু: 60 মদিনা)

সাগরিদ: জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, উরওয়া ইবনে জুবাইর, আমর ইবনে সালীম ইবনে খালাদা, আব্বাছ ইবনে সাহল বিন সাদ, মুহাম্মদ বিন আমর ইবনে আছ,

রেওয়ায়েত: সহীহ বুখারী: 14, সহীহ মুসলিম 8, সুনান আবু দাউদ: 5টি, জামী তিরমিজী: ২, সুনান নাসায়ী: 5, সুনান ইবনে মাজাহ: 5টি।

<http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=4&bookhad=3058>

মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন আতা নবী (স.)-এর একদল সাহাবীর সঙ্গে বসা ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা নবী (স.)-এর সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন আবূ হুমাইদ সায়ীদী (রা.) বলেন, আমিই তোমাদের মধ্যে রসূল স.-এর সালাত সম্পর্কে বেশী মনে রেখেছি। আমি তাঁকে দেখেছি তিনি তাকবীর বলে দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আর যখন রুকূ করতেন তখন দুই হাত দিয়ে হাঁটু শক্ত করে ধরতেন এবং পিঠ সমান করে রাখতেন। তারপর রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন যাতে মেরুদন্ডের হাড়গুলো নিজ নিজ স্থানে ফিরে আসত। এরপর যখন ছিজদা করতেন তখন দুই হাত সম্পূর্ণভাবে মাটির উপর বিছিয়ে দিতেন না, আবার গুটিয়েও রাখতেন না। এবং তাঁর উভয় পায়ের আঙ্গুলীর মাথা কেবলামুখী করে দিতেন এবং যখন শেষ রাকাআতে বসতেন তখন বাম পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতম্বের উপর বসতেন। (বুখারী আরও রেওয়ায়েত করেছেন দারেমী, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ)

**গাসীলুল মালায়িকা হানজালা বিন আবূ আমির**

নাম হানজালা, খেতাব ‘গাসীলুল মালায়িকা’ ও তাকী। মদীনার আউস গোত্রের আমর ইবন আউফ শাখার সন্তান। পিতার নাম আবু আমির, মাতা খাজরাজ নেতা মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের বোন ছিলেন। হানজালার জন্ম ও কৈশোর সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। হানজালার পিতা আবূ আমির জাহিলী আরবে দীনে হানীফের একজন বিশ্বাসী হিছাবে নবুওয়াত, কিয়ামত ইত্যাদি বিশ্বাস করতেন। এই বিশ্বাস তাঁকে ‘রুহবানিয়্যাত’ (বৈরাগ্য)-এর দিকে নিয়ে যায় এবং পার্থিব নেতৃত্ব ছেড়ে ধর্মীয় নেতৃত্ব অর্জন করেন। জীবনের এক পর্যায়ে নির্জনবাস অবলম্বন করেন। একারণে তিনি ‘রাহিব’ (বৈরাগী) হিসবে খ্যাতি লাভ করেন। (ইছাবা- ১/৩৬১)

এদিকে রসূল (স.) মদীনায় হিজরত করত আবু আমির ও আবদুল্লাহ ইবন উবাই দোনোজনের নেতৃত্বে ভাটা পড়ে। আবদুল্লাহ ইবন উবাই মুনাফিকী (দ্বিমুখী) নীতি অবলম্বন করে মদীনাতেই বাস করতে থাকে। কিন্তু আবূ আমির মদীনা ছেড়ে মক্কায় চলে যায় এবং সেখানেই বাস শুরু করে। উহুদ যুদ্ধে তিনি কুরাইশ বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে মদীনা আক্রমণে আসে। একারণে রসূল (সা.) তাকে ‘ফাছিক’ নামে অভিহিত করেন। যুদ্ধ শেষে সে মক্কায় ফিরে যায়। হিজরী অষ্টম সনে মুসলিমদের দ্বারা মক্কা বিজিত হলে সে রোমান সম্রাট হিরাকলের দরবারে পৌঁছে এবং সেখানেই হিজরী দশ সনে মারা যায়। অপর দিকে তাঁর বেটা হানজালা ইসলাম কবুল করে আবেদন জানান, রসূলুল্লাহ! আপনি নির্দেশ দিলে আমি আমার পিতাকে হত্যা করতাম। কিন্তু রসূল সা.) তাঁর এ আবেদন মঞ্জুর করেননি।

হানজালা বদর যুদ্ধে যোগ দেন নি। তবে উহুদ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। আর এটাই ছিল তাঁর ইসলামী জীবনের পহেলা ও শেষ যুদ্ধ।

তিনি বিবির সাথে হয়ে ঘরে শুয়ে ছিলেন। এমন সময় ঘোষকের এলান কানে গেলঃ ‘এক্ষুনি জিহাদে বের হতে হবে।’ জিহাদের ডাক শুনে পবিত্রতা গোসলের কথা ভুলে গেলেন। অশুচি অবস্থায় কোষমুক্ত তলোয়ার হাতে উহুদের ময়দানে হাজির হলেন। যুদ্ধ শুরু হল। তিনি আবু সুফয়ানের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হলেন। তাকে কাবু করে তলোয়ারের আঘাত করবেন, ঠিক সেই সময় কাছ থেকে শাদ্দাদ ইবন আসওয়াদ লায়ছী দেখে ফেলে এবং দ্রুত হানজালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তরবারির এক আঘাতে তাঁর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। (ইবন হিশাম- ২/৭৫, ১২৩)

বদর যুদ্ধে আবূ সুফয়ানের পুত্র ‘হানজালা’ মুসলিম বাহিনীর হাতে নিহত হয়। তাই উহুদে এই হানজালাকে হত্যার পর সে মন্তব্য করেঃ ‘হানজালার পরিবর্তে হানজালা।’

হানজালা (রা.) নাপাক অবস্থায় শহীদ হন। শাহাদতের পর ফিরিশতারা তাঁকে গোসল দেয়। তাই দেখে রসূল (সা.) সাহাবীদের বললেন, তোমরা তার বিবিকে জিজ্ঞেস কর ব্যাপার কি? হিশাম ইবন উরওয়া বর্ণনা করেছেন, রসূল (সা.) হানজালার বিবিকে জিজ্ঞেস করলেনঃ হানজালার ব্যাপারটি কি? তার বিবি বললেন, হানজালা নাপাক ছিল। আমি তাঁর মাথার একাংশ মাত্র ধুইয়েছি, এমন সময় জিহাদের ডাক তাঁর কানে গেল। গোসল অসম্পূর্ণ রেখেই বেরিয়ে গেলেন এবং শাহাদত বরণ করলেন। একথা শুনে রসূল (স.) বললেনঃ এজন্য আমি ফিরিশতাদেরকে তাঁকে গোসল দিতে দেখেছি। (ইসতীয়াব, ইছাবার টীকা- ১/২৮১) আর এখান থেকই ‘গাসীলুল মালায়িকা’ (ফিরিশতাকুল কর্তৃক গোসলকৃত) খেতাবে ভূষিত হন।

হানজালা মৃত্যুর সময় আবদুল্লাহ নামে এক ছেলে রেখে যান। রসুলের (সা.) মদীনায় আগমনের পর এই আবদুল্লাহর জন্ম হয় এবং রসূলের (সা.) ওফাতের সময় তাঁর বয়স হয় মাত্র সাত-আট বছর। পরিণত বয়সে তিনি পিতার যোগ্য উত্তরসুরী বলে নিজেকে প্রমাণ করেন। উমাইয়্যা রাজা ইয়াযিদ ইবন মুয়াবিয়ার কর্মকান্ডের প্রতিবাদে তাঁর প্রতি কৃত বাইয়াত প্রত্যাখ্যান করে তিনি আবদুল্লাহ ইবন জুবায়রের (রা.) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ইয়াজীদের বাহিনী মদীনা হামলা করে। আবদুল্লাহ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মদীনাবাসীদের সাথে নিয়ে নিজেই সেনাপতি হিসেবে হামলাকারীদের বাধা দেন। অসংখ্য মদীনাবাসী শহীদ হন। একের পর এক আবদুল্লাহর আট পুত্র ইয়াজীদ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হন। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য আবদুল্লাহ স্বচক্ষে দেখেন। অবশেষে তিনি নিজেই আগে বাড়েন। উহুদে শাহাদাতপ্রাপ্ত পিতার রক্তরাঙা পোশাক পরে তিনি দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শহীদ হন। এ ছিল হিজরী ৬৩ সনের জ্বিলহজ্জ মাসের ঘটনা।

হানজালার পিতা ‘ফাছিক’ ছিলেন। আর এই ‘ফাছিক’ পিতার সন্তান হানজালা ‘তাকী’ (আল্লাহভীরু) খেতাব লাভ করেন। ইবন আসাকির বর্ণনা করেছেন, উমার যখন লোকদের ভাতার ব্যবস্থা করেন তখন হানজালার ছেলে আবদুল্লাহর জন্য দুই হাজার দিরহাম নির্ধারণ করেন। তালহা তাঁর ভাইয়ের ছেলের হাত ধরে খলীফার কাছ নিয়ে গেলেন। খলীফা তাঁর জন্য কিছু কম অংক নির্ধারণ করলেন। তালহা বললেনঃ আমীরুল মুমিনীন। আপনি এই আনসারীকে আমার ভাতীজার চেয়ে বেশি দিলেন? খলীফা বললেনঃ হ্যাঁ। কারণ, তাঁর পিতা হানজালাকে আমি উহুদে অসির নীচে এমনভাবে হারিয়ে যেতে দেখেছি যেমন একটি উট হারিয়ে যায়। (হায়াতুস সাহাবা-২/২১৮)

**হানজালা বিন রাবী**

হানজালা (রা.) কাতেবে অহী (অহী লিখক) ছিলেন।

হানজালা (রা.) বলছেন, আমরা যখন নবী (স.)-এর সাথে ছিলাম, খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করুন তিনি কি বলতে যাচ্ছেন, তিনি বলেন, ব্যাপারটা অনেকটা এমন ছিল যে আমরা যেন জান্নাত ও জাহান্নাম চোখের সামনে দেখতে পেতাম। আমাদের মনে হত আমরা যেন এই পৃথিবীতে নেই, যেন জান্নাত ও জাহান্নাম আমাদের সামনেই আছে। পৃথিবী বলে কিছু নেই। তারপর আমরা বাসায় চলে আসলাম, আর আমি আমার বাচ্চাদের সাথে খেলা শুরু করলাম, পরিবারের সাথে হাসাহাসি শুরু করলাম এবং হঠাৎ আমার মনে হল আমি মনে হয় একজন মুনাফিক। তিনি আবু বকর (রা.)-এর কাছে গেলেন এবং বললেন, আমি একজন মুনাফিক। আবু বকর (রা.) বললেন, কেন? কারণ আমরা নবী (স) এর সামনে যেভাবে থাকি, অন্য সময় সেভাবে থাকি না। আবু বকর (রা.) বললেন, তাহলে আমিও একজন মুনাফিক। তাই তারা দুইজন রসুল (স)-এর কাছে গেলেন, এবং বললেন যে তারা মুনাফিক। সুবহানাল্লাহ, একবার ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। নবী (স.) বললেন, কেন? তারা বললেন, হে রসুল, আমরা যখন আপনার সাথে থাকি তখন একরকম থাকি, কিন্তু যখন বাসায় যাই, আমরা দুনিয়ার অন্য ব্যাপারে মনযোগী হয়ে যাই, এবং আখিরাতের কথা ভুলে যেতে থাকি। তখন নবী (স.) বললেন, হানজালা, যদি তুমি হামেশা এমনটাই থাকতে যেমন তুমি আমার সামনে থাক, তাহলে ফেরেস্তারা তোমার সাথে বাস্তবিক অর্থে মুছাফাহা করত।

**তামিম দারী**

তামিম দারী (ম. 40 হি) ইরাকের হিরা (কুফা) এলাকায় বসবাসরত আরব কবীলা বনু লাখমের সদস্য। (সিয়ার নুবালা) তামিম আগে খ্রিস্টান ছিলেন। (ইছাবা) তার একজন পূর্বপুরুষের নাম ছিল দার। এ থেকে দারী।

ইবন আব্বাছ (রা.) বলেন, সাহম গোত্রের এক ব্যক্তি তামীম দারী ও আদী ইবন বাদ্দার সঙ্গে সফরে বের হন এবং সাহম গোত্রের ব্যক্তিটি এমন এক জায়গায় মারা যান, যেখানে কোন মুসলিম ছিল না। তারা দু’জন তার পরিত্যক্ত জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এলে মৃতের আত্মীয়রা তার মধ্যে স্বর্ণখচিত একটি রূপার পেয়ালা পেল না। এ সম্পর্কে তাদের দু’জনকে আল্লাহর রসূল (স.) কসম করালেন। এরপর পেয়ালাটি মক্কা্য় পাওয়া গেল। (যাদের কাছ পাওয়া গেল) তারা বলল, আমরা এটি তামীম ও আদীর কাছ থেকে খরিদ করেছি। এরপর মৃতের আত্মীয়দের মধ্য থেকে দুই জন দাঁড়িয়ে কছম করে বলে, এ দু’জনের সাক্ষ্য থেকে আমাদের সাক্ষ্য বেশি গ্রহণীয়। নিশ্চয়ই এ পেয়ালাটি তাদের আত্মীয়ের। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের সম্বন্ধে এই আয়াত নাজিল হয়ঃ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হাজির হয় তখন তোমাদের মধ্য থেকে দু’ জন ন্যায়পরায়ণ লোককে অসিয়ত করার সময় সাক্ষী রাখবে। . . . . .. .. . আল্লাহ ফাছিক লোকদের সৎ পথে চালিত করেন না। [মায়িদাহ্ ১০৬-১০৮] (বুখারী 2780)

বর্ণনা: সহীহ মুসলিম: 3 সুন্নাতে আবু দাউদ: 3 জামী তিরমিজী: ২, সুনান নাসায়ী ২, সুনান ইবনে মাজাহ 3।টি।

সাগরিদ: ইবনে উমর, ইবনে আব্বাছ, আবু হুরাইরা, আনাস বিন মালেক, জাররাহ বিন আউফা আরিমি হারশী, রউইন বিন জাবা জাফলি, আব্দুল্লাহ বিন মহম্মদ হামাদানী, আতা ইবনে ইয়াসিদ লায়েছি জুন্দী, শাহর ইবনে হাওশাব আশআরি, আব্দুর রহমান ইবনে গনম

তামীম দারি (রা.) বলেন, আল্লাহর রসূল (স.) বলেনঃ যে রাতে একশত আয়াত পড়বে তাকে রাতের আনুগত্যের ছওয়াব দেয়া হবে। (আহমদ, দারিমী)

তামীম দারি (রা.) কুরআনের কারী ছিলেন।

উমর (রা.) তামীম দারি (রা.)কে তারাবীহ সালাতের ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন।

**ফাইরুজ দায়লামী**

ফাইরুজ দায়লামী (ম 53 হি/673 ইংরেজি) ইয়ামানী ফার্সি প্রিন্স, ছাহাবী। আবু আব্দুল্লাহ ও আবু আব্দুর রহমান নামে পরিচিত, এছাড়াও 632 সনে আছওয়াদ আনছীকে হত্যা করতে সাহায্য করেছেন।

ইমাম নববী বলেন: "রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে প্রতিনিধি হিছাবে মদীনাতে আসেন, ইসলাম কবুল করেন এবং মিথ্যা নবী আছওয়াদ আনছীকে হত্যা করেন, আল্লাহর রসূল (স.)-কে হত্যার খবর দিলে, তিনি বলেন: "ভাল মানুষ ফাইরুজ দায়লামী তাকে হত্যা করেছে। (তাহজীবুল আছমা 1/567)

জাহহাক বিন ফায়রূজ দায়লামী তার পিতা ফাইরূজ দায়লামী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী (স.)-এর কাছে এসে বললাম, হে রসূলাল্লাহ্, আমি ইসলাম কবুল করেছি আর আমার অধীনে দুই বোন রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, এদের যাকে ইচ্ছা তুমি বাছাই করে নাও। (আবূ দাউদ ২২৪৩, তিরমিজী ১১২৯, ইবন মাজাহ ১৯৫১)

ফায়রূজ দায়লামী (রা.) বলেন, একদা আমি নবী (স.)-এর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি জানেন, আমরা কারা এবং কোথায় আমরা থাকি, আর কার কাছে এসেছি? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের কাছে এসেছ। তখন আমি বলি, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের ওখানে প্রচুর আঙুর উৎপন্ন হয়, আমরা তা দিয়ে কি করব? তিনি বলেনঃ তোমরা তা কিশমিশ বানাবে। এরপর জিজ্ঞাসা করিঃ আমরা কিশমিশ বানিয়ে কি করব? তিনি বলেনঃ তোমরা তা সকালে ভিজিয়ে রেখে সন্ধ্যায় পান করবে এবং সন্ধ্যায় ভিজিয়ে রেখে সকালে পান করবে। আর তা চামড়ার মশক ও কলসীর মধ্যে ভিজাবে না। কেননা, তা চটকাতে বিলম্ব হলে সির্কা হয়ে যাবে। (আবু দাউদ 3710, নাছায়ী, আহমদ, সহীহ)

তিনি বায়তুল মুকাদ্দাছে মারা যান। (ইবনে হিব্বান) উছমান (রা.)-এর খিলাফতকালে মারা যান। (ইবনে ছাদ)

বারা ইবন আজিব

বারা ইবন আজিব (রা.) মদীনাবাসী সাহাবী।

তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (ছ.)-এর সঙ্গে একজন আনসার সাহাবীর জানাজায় শরীক হই, এমন কি তার কবরের কাছে যাই, যা তখনও তৈরী হয়নি। তখন রসূলুল্লাহ (ছ.) সেখানে বসেন এবং আমরাও তাঁর সাথে তাঁর চারদিকে শান্তভাবে বসে পড়ি, যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসা। এ সময় নবী (ছ.)-এর হাতে একখণ্ড কাঠ ছিল, যা দিয়ে তিনি জমীনের উপর আঘাত করছিলেন। এরপর তিনি মাথা উঁচু করে দুই বা তিনবার বলেন, তোমরা কবরের আজাব থেকে আল্লাহ্‌র কাছে নাজাত চাও। রাবী জারীরের বর্ণনায় অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, দাফনের পর লোকরা যখন ফিরে যায় এবং সে তাদের আওয়াজ শুনতে পায়, তখন তাকে ছওয়াল করা হয়, ওহে! তোমার রব কে, তোমার দীন কি আর তোমার নবী কে? রাবী হান্নাদ বলেন, নবী (ছ.) বলেছেন, তখন তার কাছে দুইজন ফেরেশতা আসে এবং তাকে বসিয়ে ছওয়াল করে, তোমার রব কে? তখন সে বলে, আল্লাহ্‌ আমার রব। তখন তারা তাকে ছওয়াল করে, তোমার দীন কী? সে বলে, আমার দীন ইসলাম। এরপর তারা তাকে ছওয়াল করে, ইনি কে, যাকে তোমাদের কাছে পাঠান হয়েছিল? তখন সে বলে, ইনি আল্লাহর রসূল। তখন ফেরেশতারা ছওয়াল করে, তুমি এসব কিভাবে জানলে? তখন সে বলে, আমি আল্লাহ্‌র কিতাব পড়েছি, এর উপর ঈমান এনেছি এবং একে সত্য বলে মনে করেছি। জারীর বলেন, আল্লাহ্‌র বাণী: ''আল্লাহ্‌ মুমিনদের ইহজীবন ও পরজীবনে চিরন্তন বাণীর উপর মজবুত রাখেন'' - এর মানে এটাই।

রাবী বলেন, এরপর আসমান থেকে একজন আহবানকারী ঘোষণা দিতে থাকে, আমার বান্দা সত্য বলেছে, তার কবরে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের দিকে একটা দুয়ার খুলে দাও। রাবী বলেন, তখন তার কবরে জান্নাতের মৃদু বাতাস ও খোশবু আসতে থাকে এবং তার কবরকে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেয়া হয়।

এরপর তিনি কাফির লোকের মওতের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, কবরে রাখার পর তার আত্মাকে দেহের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। তখন দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসায় এবং সওয়াল করে, তোমার রব কে? তখন সে বলে, (হা হা লা আদরী; অর্থাৎ) আফসোস, আমি তো জানিনা। এরপর তারা তাকে সওয়াল করে, তোমার দীন কী? সে বলে, আফসোস আমি জানি না। এরপর তারা তাকে সওয়াল করে, এ ব্যক্তি কে, যাকে দুনিয়াতে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল? তখন সে বলে, হায় আফসোস! আমি জানি না। তখন আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী বলতে থাকে, সে মিথ্যা বলেছে। তার কবরে আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে আগুনের পোশাক পরাও এবং তার কবর থেকে জাহান্নামের দিকে একটা দুয়ার খুলে দাও; যাতে তার কবরে জাহান্নামের আগুনের ভীষণ তাপ ও ভাঁপ আসতে থাকে। এরপর কবর তার জন্য এতই সংকুচিত হয়ে যায় যে, তার পাজরের একপাশ অন্য পাশে চলে যায়। রাবী জারীর আরো বর্ণনা করেন, এরপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিয়োগ করা হয় এবং তার হাতে এমন একটা লোহার মুগুর থাকে, যদি তা দিয়ে দুনিয়ার কোন পাহাড়ে উপর আঘাত করা হয়, তবে তা চূর্ণ হয়ে ধুলিতে পরিণত হবে। এরপর সে ফেরেশতা মুগুর দিয়ে তাকে এমনভাবে পিটাতে থাকে, যার শব্দ জিন ও ইনসান ছাড়া পূব-পশ্চিমের সমস্ত মাখলূক শুনতে পায় এবং তার দেহ চূর্ণ হয়ে ধূলায় পরিণত হয়। এরপর তার মধ্যে পুনরায় রুহ ফুঁকে দেয়া হয়। (আবু দাউদ, আহমদ; হাদীসটি হাসান)

 উবাদাহ ইবনুস সামিত

উবাদা মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনী সালীম শাখার সন্তান। হিজরতের ৩৮ বছর পূর্বে ৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ইয়াসরিবে জন্মগ্রহণ করেন। (আলাম- ৪/৩০) পিতা সামিত ইবন কায়স এবং মাতা কুররাতুল আইন। (উসুদুল গাবা- ৩/১০৬) উবাদার ভাই আউস ইবন সামিতের স্ত্রী খুওয়াইলা বিনতু সালাবা। তিনি সেই মহিলা যাঁর শানে সূরা মুজাদিলার জিহারের আয়াত নাযিল হয়। (আনসাবুল আশরাফ- ১/২৫১)

মদীনার পশ্চিম দিকে কুবা সংলগ্ন প্রস্তরময় অঞ্চলে ছিল বনী সালীমের বসতি। ‘উতুম কাওয়াকিল’ নামে সেখানে তাদের কয়েকটি কিল্লা ছিল। এরই ভিত্তিতে বলা চলে উবাদার বাড়ীটি মদীনার কেন্দ্রস্থলের বাইরে ছিল।

আকাবার প্রথম শপথে যে-বার ছয়জন মদীনাবাসী রসূল (স.)-এর হাতে হাত রেখে বাইয়াত করেন, উবাদা তাঁদের একজন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আকাবায়ও শরিক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন তিনি। অনেকের মতে তিনি দ্বিতীয় আকাবায় বারোজনের সাথে ইসলাম কবুল করেন। তৃতীয় তথা শেষ আকাবায় রসূলুল্লাহ স. মনোনীত বারো নাকীবের (দায়িত্বশীল) অন্যতম নাকীব। তিনি হন বনী কাওয়াকিল এর নকীব। (তাবাকাত- ৩/৫৪৬)

আবূ ইদরিছ বলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও লায়লাতুল আকাবার একজন নকীব উবাদা ইবনুস সামিত (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল [স]-এর পাশে একজন সাহাবীর উপস্থিতিতে তিনি ইরশাদ করেনঃ তোমরা আমার কাছে এই মর্মে বায়আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, জেনা করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং নেক কাজে নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যে তা পূরণ করবে, তার বিনিময় আল্লাহ্‌র কাছে। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তবে তা হবে তার জন্য কাফ্‌ফারা। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং আল্লাহ্ তা অপ্রকাশিত রাখলে, তবে তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। তিনি যদি চান, তাকে মাফ করে দেবেন আর যদি চান, তাকে শাস্তি দেবেন। আমরা এর উপর বায়আত গ্রহণ করলাম। [বুখারী 18]

উল্লেখ্য যে, বনী আমর ইবন আওফ ইবন খাযরাজ সেই প্রাচীন কাল থেকে ‘কাওয়াকিল’নামে পরিচিত। ‘কাওকালা’শব্দটির অর্থ এক বিশেষ ধরণের চলন।’এ নামে আখ্যায়িত হওয়ার কারণ হল, যখন কোন ব্যক্তি তাদের আশ্রয় গ্রহণ করতো তখন তারা লোকটির হাতে একটি তীর দিয়ে বলতো, যাও, এখন ইয়াসরিবের যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াও। (ইবন হিশাম ১/৪৩১)

উবাদার জীবনটি ছিল প্রাণরসে ভরপুর। ইসলাম গ্রহণ করে মক্কা থেকে ফিরে এসেই সর্বপ্রথম মা-কে ইসলামের দীক্ষিত করেন। মদীনায় কা’ব ইবন আজরা নামে তাঁর চিল এক অন্তরঙ্গ বন্ধু। তখনও সে অমুসলিম এবং তার বাড়ীতে ছিল বিরাট এক মূর্তি। উবাদার সব সময়ের চিন্তা হল কিভাবে এ বাড়ীটি শিরক থেকে মুক্ত করা যায়। একদিন সুযোগমত বাড়ীর মধ্যে ঢুকে মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলেন। অবশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় কা’ব মুসলিম হন।

বদর, উহুদ, খন্দক সহ সকল যুদ্ধে উবাদা রসূল (স.)-এর সাথে যোগ দেন। (উসুদুল গাবা- ৩/১০৬) বদর যুদ্ধের পর গনীমতের মাল (যুদ্দলব্ধ সম্পদ) এর ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে মুজাহিদদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। তখন সূরা আনফালের প্রথম থেকে কতগুলি আয়াত নাযিল হয় এবং এ ঝগড়ার পরিসমাপ্তি ঘটে। ইবন হিশাম বলেন, সূরা আনফালের উল্লেখিত আয়াত সম্পর্কে ’উবাদাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দেন, আয়াতগুলি আমাদের বদরী যোদ্ধাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। বদরের দিন আমরা আনফাল এর ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি করি এবং তা নিয়ে যখন আমাদের আখলাকের অবনতি ঘটে তখন আল্লাহ আমাদের হাত থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে রসূল (স.)-এর হাতে তুলে দেন। তিনি আমাদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দেন। (সীরাতু ইবন হিশাম- ১/৬৬)

এই বদর যুদ্ধের সময়ই মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের ইঙ্গিতে মদীনার ইয়াহুদী গোত্র বনু কায়নুকা রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাদের সাথে উবাদার গোত্র বনী আউফের বহু আগে থেকেই মৈত্রী চুক্তি ছিল। তেমনিভাবে চুক্তি ছিল মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সুলূলেরও। তাদের বিদ্রোহের কারণে রসূল সা. যখন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন তখন উবাদা ছুটে গেলেন রসূল (স.)-এর কাছে এবং তাদের সাথে চুক্তি বাতিলের প্রকাশ্য ঘোষনা দিয়ে বললেনঃ আমি তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন ও দায়মুক্তির ঘোষণা করছি। আর আল্লাহ, আল্লাহর রসূল ও মুমিনদেরকে আমার বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করছি। অন্যদিকে আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সুলূল তার পূর্ব অবস্থায় অটল থাকে। বিদ্রোহ দমনের পর তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রসূলুল্লাহ স. বহিষ্কারের এই কাজটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব উবাদার ওপর অর্পণ করেন। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে সূরা মায়িদার ৫১ নং আয়াত থেকে ৫৮ নং পর্যন্ত আয়াতগুলি নাযিল হয়। আয়াতগুলিতে স্পষ্টতঃ উবাদার প্রশংসা ও মুনাফিক ইবন উবাইয়ের নিন্দা করা হয়েছে। (ইবন হিশাম- ২/৪৯)

ষষ্ঠ হিজরীর বাইয়াতুর রিজওয়ানে তিনি শরিক ছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ- ৫/৩১৯) ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত বনী মুসতালিক এর যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম- ২/২৯০)

আবু বকর রা. খিলাফতকালে শামে যে সকল অভিযান পরিচালিত হয় তার বেশ কটিতে উবাদা অংশগ্রহণ করেন। উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে আমর ইবন আছ মিসরে অভিযান পরিচালনা করেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি চূড়ান্ত বিজয় লাভে সক্ষম না হয়ে মদীনায় খলীফার কাছে অতিরিক্ত সাহায্য চেয়ে পাঠান। খলীফা উমার রা. চার হাজার মতান্তরে দশ হাজার সৈন্যের একটি অতিরিক্ত বাহিনী পাঠান। উবাদা ছিলেন সেই বাহিনীর এক চতুর্থাংশ সৈন্যের কমান্ডিং অফিসার। (ইসাবা- ২/২৬৮) খলীফা আমর ইবনুল আছকে একটি চিঠিতে আরও লেখেন এই অফিসারদের প্রত্যেকেই একহাজার সৈন্যের সমান। এই অতিরিক্ত বাহিনী মিসর পৌঁছার পর আমর ইবনুল আস সকল সৈন্য একত্র করে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দান করেন। ভাষণ শেষ করে তিনি উবাদাকে ডেকে বলেন, আপনার নিযাটি আমার হাতে দিন। তিনি নিযাটি নিয়ে নিজের মাথার পাগড়ীটি খুলে নিযার মাথায় বাঁধেন। তারপর সেটি উবাদার হাতে তুলে দিতে গিয়ে বলেন, এই হচ্ছে সেনাপতির আলাম বা পতাকা। আজ আপনিই সেনাপতি। প্রথম আক্রমণেই শহরের পতন ঘটে।

উবাদা বিভিন্ন সময়ে ইসলামী খিলাফতের তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। ১. সাদাকা বিষয়ক অফিসার ২. ফিলিস্তিনের কাজী ৩. হিমসের আমীর।

রসূল স. জীবনের শেষ দিকে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করেন। উবাদাকেও কোন একটি অঞ্চলে নিয়োগ দান করেন। যাত্রাকালে রসূলুল্লাহ স. তাঁকে উপদেশ দেনঃ আল্লাহকে ভয় করবে। এমন যেন না হয়, কিয়ামতের দিন চতুষ্পদ জন্তুও তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। (উসুদুল গাবা- ৩/১০৬)

উমারের রা. খিলাফতকালে এক সময় তাঁকে ফিলিস্তীনের কাজী নিয়োগ করা হয়। সেই সময় উক্ত অঞ্চলটি ছিল মুয়াবিয়ার রা. ইমারাতের অধীনে। এক সময় কোন একটি বিষয়ে দু’জনের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয় এবং এক পর্যায়ে মু’য়াবিয়া রা. তাঁর প্রতি কিছু কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন। তিনিও প্রত্যুত্তরে মুয়াবিয়াকে বলেন, আগামীতে আপনি যেখানে থাকবেন আমি সেখানে থাকব না। তিনি মদীনায় চলে আসেন, খলীফা উমার রা. এভাবে তাঁর চলে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি পুরো ঘটনা খুলে বলেন। সবকিছু শোনার পর উমার রা. বললেনঃ আপনার স্থানে আবার আপনি ফিরে যান। এ জমীন আপনার মত লোকদের জন্য ঠিক আছে। আপনিও আপনার মত লোকেরা যেখানে নেই আল্লাহ সেই স্থানের মঙ্গল করুন। অতঃপর তিনি আমীর মুয়াবিয়াকে রা. একটি চিঠি লিখে জানিয়ে দেনঃ আমি উবাদাকে তোমার কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন করে দিলাম। (উসুদুল গাবা- ৩/১০৬) ফিলিস্তীনের বিচার বিভাগের এই পদটি সর্বপ্রথম ’উবাদার হাতে ন্যস্ত করা হয়। ইমাম আওযাঈ বলেনঃ উবাদা ফিলিস্তীনের প্রথম কাজী। (উসুদুল গাবা- ৩/১০৬)

আবু উবায়দাহ রা. যখন শামের আমীর তখন তিনি উবাদা ইবনুস সামিতকে হিমসে তার প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করেন। এই হিমসে অবস্থানকালে তিনি লাজিকিয়্যা জয় করেন। এই অভিযানে তিনি এ নতুন সামরিক টেকনিক প্রয়োগ করেন। তিনি এমন সব বড় বড় গর্ত খনন করেন যে, তার মধ্যে একজন অশ্বারোহী তার অশ্বসহ সহজে লুকিয়ে থাকতে পারত। (ফুতুহুল বুলদান- ১৩৯)

উবাদা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শামে বসবাসরত ছিলেন। হিজরী ৩৪/৬৫৪ সনে রামলা মতান্তরে বায়তুল মাকদাসে ৭২ (বাহাত্তর) বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। (ইসাবা- ২/২৬৯)

উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, নবী (স.) বলেন, “সম্ভবত তোমরা তোমাদের ইমামের পিছে পড়ে থাক, এটা করো না তবে সূরা ফাতিহা ছাড়া, কারণ যে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার সালাত হয় না।” (তিরমিজীযী আরও আবু দাউদ, আহমদ, হাকিম; হাদীসটির সনদ তিরমিযী হাসান বলেছেন, কিন্তু দারাকুতনী, বায়হাকী ও অহমদ শাকের সহীহ বলেছেন।)

**কায়েছ** **ইবনু আছিম**

কায়েছ ইবনু আছিম নাজদের বনু তামীমের অন্যতম সর্দার ছিলেন। ......................

সাগরিদ: হাকিম বিন কায়েছ [পুত্র], খলীফা বিন হুছাইন বিন কায়েছ [পৌত্র], শুবা বিন তাওয়াম।

কায়েছ (রা.) বলেন, আমি ইসলাম কবুলের এরাদায় নবী (ছ.)-এর কাছে এলাম। তিনি আমাকে বড়ই-পাতা মিশানো পানি দিয়ে গোসল করার নির্দেশ দেন। (আবু দাউদ 355, তিরমিজী 605, নাসাঈ 189, আহমদ 21153, তাবারানী মুজাম কবীর 866; সহীহ)[[4]](#footnote-4)

নবম হিজরীতে বনু তামীমের প্রতিনিধিদল যখন মদীনায় আসে, তিনি তাদের সাথে আসেন। রসূল [স.]-এর সাথে প্রতিনিধিদলের আলোচনার পর বনু তামীমের যারা আগে ইসলাম কবুল করেনি তারাও ইসলাম কবুল করে।

...................................................

বর্ণনা: সুনান আবি দাউদ 1টি, জামি তিরমিযি 1টি, সুনান নাসাঈ: 2টি, আহমদ 3টি।

হাকীম ইবনু কায়েছ থেকে বর্ণিত যে, কায়েছ ইবনু আছিম (রা.) বলেছেন, তোমরা আমার জন্য বিলাপ করবে না। কেননা রসুলুল্লাহ [স.]-এর জন্য বিলাপ করা হয়নি। [নাছায়ীi 1851, আহমদ 21154]

কায়স ইবনু আছিম (রা.) বলেছেন, অজ্ঞতা যুগে যে হিলফ করা হয়েছিল তা পূরণ কর, তবে ইসলামে শপথ হিলফ নেই [আহমদ 21155, তাবারানী মুজাম কবীর 864] এখানে হিলফ বলতে কোন ব্যক্তি বা ... কুরআন 4.33 এর তাফছীরে এই হাদীসটি আলোচিত হয়। ....

[إني وأدت ثماني بنات لي في الجاهلية, ] [তাবারানী মুজাম কবীর 863, বাজজার] ...

তিনি বসরায় মারা যান।

**সাওদা বিনতে জাম্আ (রা)**

সাওদা (রা) সেই ভাগ্যবতী মহিলা যাঁকে রসূল (স.) উম্মুল মুমিনীন খাদীজার (রা) মৃত্যুর পর বিয়ে করেন। সাওদার জন্ম মক্কায়। পিতা জাম্আ ইবন কায়স কুরাইশ বংশীয় এবং মাতা শামূস বিনতে কায়ছ মদীনার নাজ্জার গোত্রীয়। (ইছাবা 4/117)

জাহিলী যুগে সাওদার পহেলা বিয়ে হয় সাকরান ইবন আমরের সাথে। রসূল (স)-এর নুবুওয়াত লাভের পরপর সাওদা ও সাকরান (سكران) ইসলাম কবুল করেন। (মুন্তাজাম, ইবনুল জাওজী 5/276) কুরাইশদের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য মক্কার অসহায় মুসলিমদের পহেলা দলটি যখন হাবশায় হিজরত করেন তখনও এই মুসলিম পরিবারটি মক্কায় থাকে। কিন্তু তাদের অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন মক্কার মুসলিমের দ্বিতীয় একটি দলের সাথে সাওদা তাঁর স্বামীসহ হাবশায় হিজরত করেন। (তাহজীবুত তাহজীব 12/378)

হাবশায় কয়েক বছর অবস্থানের পর আবার মক্কার ফিরে আসেন। সাকরান মুসলিম অবস্থায় মক্কায় মারা যান।

খাদীজা (রা)-এর ইন্তিকালের ... বছর পর রসূল (স)-এর মদীনায় হিজরতের প্রায় তিন বছর আগে তিনি সাওদা (রা)-কে বিয়ে করেন। খাদীজা (রা)-এর অনুপস্থিতিতে মাতৃহারা সন্তানদের লালন-পালন ও ঘর সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। উপরন্তু পৌত্তলিকদের উৎপাতের মাত্রাও বেড়ে যায়। উছমান ইবন মাজউনের বিবি খাওলা বিনতে হাকীম একদিন রসূল (স)-এর কাছে গেলেন। এক সময় তিনি বললেন, হে রসূল! আপনি আবার বিয়ে করুন! প্রশ্ন করলেনঃ পাত্রী কে? খাওলা বললেনঃ বিধবা এবং কুমারী-দুই রকম পাত্রীই আছে। তিনি আবার জানতে চাইলেনঃ কি তাদের পরিচয়? খাওলা বললেনঃ বিধবা পাত্রী সাওদা বিনতে জাম্আ আর কুমারী পাত্রী আবু বকরের মেয়ে আশিয়া। রসূল (স) সম্মতি দেন। রসূল (স)-এর অনুমতি পেয়ে খাওলা যথাক্রমে সাওদা ও আয়িশার কাছে প্রসতাব নিয়ে যান এবং তাঁদের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। রসূল (স) সাওদাকে নিয়ে মক্কায় সংসার করেন। আর আয়িশার বয়স তখন মাত্র ছয় বছর। মদীনায় হিজরতের পর আয়িশাকে ঘরে তুলেন। (ইছাবা 4/117)

হিজরতের প্রায় তিন বছর আগে সাওদা (রা) রসূল (স)-এর ঘরে আসেন। নুবুওয়াতের দশম বছরের শাওয়াল মাস থেকে ত্রয়োদশ হিজরীর রবীউল আওয়াল মাস পর্যন্ত প্রায় তেরো বছর রসূল (স)-এর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। শুধূ তাঁকে নিয়েই তিনি প্রায় তিন বছর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন। বিয়ের পর আয়িশা (রা) প্রায় তিনবছর পিতৃগৃহে থাকেন। এ সময় সাওদাই ছিলেন মূলতঃ গৃহিনী। এ সময় তিনি রসূল (স)-এর মাতৃহারা কন্যাদের লালন-পালন ও গৃহস্থালীর যাবতীয় দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন। মোদ্দাকথা, রসূলের (স) জীবনের সংকটময় ভাগে সাওদা (রা) জীবনসাথী হিসাবে কঠিন দায়িত্ব পালন করে খাদীজা (রা)-এর শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করেন।

ইবনে মাছউদ (রা.) বলেন, একদিন রসূল (স.) এক মহিলাকে দেখে ভালো লেগে যায়। তখন তিনি (তার বিবি) সাওদার কাছে এলেন। এ সময় তিনি সুগন্ধি তৈয়ার করছিলেন। তার কাছে আরো মহিলারা ছিল। সাওদা তাদের থেকে উঠে নিভৃতে চলে গেলেন এবং রসূল (স.) তার হাজত পূরণ করলেন। এরপর তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে দেখে ভালো লাগলে সে যেন তার বিবির কাছে চলে যায়। কারণ ঐ মহিলার কাছে যা আছে তার বিবির কাছেও তা আছে। (দারিমী 2215 সহীহ)

আয়িশা (রা) বলেন, রসূল (স) মদীনায় পৌঁছে জায়েদ ইবন হারিছা ও আবু রাফেকে দুইটি উট ও পাঁচ শো দিরহাম দিয়ে মক্কায় পাঠান। এরপর আমরা সকলে মদীনার দিকে বেরিয়ে পড়ি। জায়েদ ও আবু রাফে মদীনায় ফিরে যান ফাতিমা, উম্মে কুলসুম, সাওদা, উম্মে আয়মান ও উছামাকে নিয়ে। (???)

পহেলা হিজরী সনে আয়িশা (রা) যখন স্বামীগৃহে আসেন তখন সতীন সাওদা বিদ্যমান। এ অবস্থায় একে অপরের ভাগ বসানোর কল্পনা করতে পারতেন। কিন্তু এই স্বাভাবিক অনুমানের একেবারে বিপরীত ছিল এই দুইজনের অবস্থা। তাঁদের সংসার জীবনের সবকিছু ছিল পারস্পরিক সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও ঐক্যের। গার্হস্থ্য জীবনের অধিকাংশ বিষয়ে সাওদা ছিলেন আয়িশার বান্ধবী। আয়িশা (রা) বলেনঃ সাওদা ছাড়া অন্য কোন মহিলাকে দেখে আমার এমন ইচ্ছা হয়নি যে, তার দেহে যদি আমার প্রাণটি হতো। (ইবনে ছাদ)

আয়িশা (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (স.)-এর জন্য আমার রান্না করা খাজীরা (**خَزِيرَةٍ**)আনলাম। এরপর সাওদাকে বললাম, খাও। নবী (স.) ছিলেন আমার ও তার মাঝে। তিনি (সাওদা) খেতে অস্বীকার করলেন। আমি বললাম, খাও, না হলে তোমার চেহারায় মেখে চেহারা ময়লা করে দেব। এরপর তিনি অস্বীকার করলেন। আমি খাজীরায় হাত রাখলাম এবং তার তার চেহারায় লেপে দিলাম। এ অবস্থা দেখে নবী (স.) হাসলেন এবং তাকে বললেন, ওর চেহারাতেও মেখে দাও। তখর উমর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বললেন, হে আব্দুল্লাহ, হে আব্দুল্লাহ (অর্থাৎ বাড়িতে কেউ আছেন কি?) তিনি মনে করলেন, হয়ত উমর ঘরে ঢুকবেন। তাই তিনি বললেন, তোমরা ওঠ, তোমাদের চেহারা ধুয়ে ফেল।(আবু ইয়ালা 4412 সহীহ)

নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান করাও ছিল তাঁর চরিত্রের এক উজ্জ্বল দিক। তাঁর জীবনে বার্ধক্য আসে এবং তার মধ্যে পুরুষের প্রতি আকর্ষণে ভাটা পড়ে। তাই তিনি স্বামী রসূলের (স) সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে নিজের ভাগের রাতটি সতীন আয়িশাকে (রা) দান করেন। আয়িশা (রা) বলেন, সওদা বিনতে জামআহ তাঁর পালার রাত আয়িশাহকে দান করেছিলেন। নবী (স) আয়িশার জন্য দু’ দিন বরাদ্দ করেন- আয়িশাহ (রা.)-র দিন এবং সওদা (রা.)-র দিন। (বুখারী)

ইবন আব্বাছ (রা) বলেন, সাওদা (রা)-এর আশংকা হল যে, নবী (স.) তাকে তালাক দিবেন। তাই তিনি বললেন, আপনি আমাকে তালাক না দিয়ে আপনার বিবাহবন্ধনে স্থির রাখুন। আমার জন্য নিৰ্দ্ধারিত দিনটি আপনি আয়িশার কাছে থাকুন। রসূলুল্লাহ (স.) তাই করলেন। এ প্রসঙ্গেই নাজিল হয়ঃ তবে তারা (স্বামী-স্ত্রী) আপোস-নিম্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন গুনাহ নেই এবং আপোস-নিম্পত্তিই শ্ৰেয়”(সূরা নিসা ১২৮)। যে বিষয়ের উপর তারা আপোষ করবে তা জায়িয। শেষের বক্তব্য ইবনু আব্বাছ (রা.)-এর। (তিরমিজী 3040, তাবারানী, বায়হাকী)[[5]](#footnote-5)

এ সম্পর্কে একবার আয়িশা (রা) উরওয়াকে বললেন, ভাগ্নে! রসূল (স) বিবিদের জন্য তার বণ্টিত রাতে অবস্থানের ব্যাপারে কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিতেন না। অনেক দিন এমন গেছে তিনি আমাদের সকলের কাছে এসে ঘুরে গেছেন, কোন বিবিকেই স্পর্শ করেননি। শেষে সেই বিবি কাছে রাত কাটিয়েছেন যার জন্য রাতটি নির্ধারিত ছিল।

পর্দার হুকুম নাজিলের আগ থেকে উমার (রা) এ বিষয়ে নির্দেশ দানের জন্য প্রায়ই রসূলের (স) কাছে দাবী জানাতেন। যেহেতু এ ব্যাপারে আল্লাহর কোন নির্দেশ আসেনি তাই তিনি চুপ থাকতেন। সে সময় মক্কার কোন ঘরের ভেতরে পায়খানার ব্যবস্থা ছিল না। পায়খানা থাকাটা তারা শোভন মনে করত না। সে সময় নারীরাও প্রাকৃতিক কর্ম সমাধার অন্য রাতের বেলা বাড়ীর বাইরে খোলা ময়দানে চলে যেত।

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূল (স.)–এর বিবিগণ রাতের বেলায় প্রাকৃতিক প্রয়োজনে মানাছে নামক খোলা ময়দানে যেতেন। আর উমর (রাঃ) নবী (স.)– কে বলতেন, ‘আপনার বিবিদেরকে পর্দায় রাখুন।’ কিন্তু রসূল তা করেননি। এক রাতে ঈশার সময় নবীর পত্নী সাওদা বিনতে জামআ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়া। উমর (রাঃ) তাঁকে ডেকে বললেন, ‘হে সাওদা! আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি।’ তার আগ্রহ ছিল যেন পর্দার হুকুম নাজিল হয়। তারপর আল্লাহ পর্দার হুকুম নাযিল করেন। (বুখারী ১৪৮) [[6]](#footnote-6)

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবীর কোন বিবি নবী (স.)-কে বললেন, আমাদের মধ্য থেকে সবার আগে (মৃত্যুর পর) আপনার সাথে কে মিলিত হবে? তিনি বললেনঃ যার হাত বেশি লম্বা। তাঁরা একটি বাঁশের কাঠির সাহায্যে হাত মেপে দেখতে লাগলেন। সাওদার হাত সকলের হাতের চেয়ে বেশি লম্বা বলে দেখা গেল। পরে আমরা বুঝতে পারলাম যে, সাদকার আধিক্য তাঁর হাত লম্বা করে দিয়েছিল। আমাদের মাঝে তিনি সবার আগে রসূল (স.)-এর সাথে মিলিত হন। তিনি সাদকা করা ভালোবাসতেন। (বুখারী 1441)

আযওয়াকে মুতাহ্হারাত (পবিত্র বিবিগণ)-এর মধ্যে সাওদা সর্বপহেলা মারা যান।

সাওদা (রা)-এর সূত্রে পাঁচটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবন আব্বাছ, ইবনুল জুবাইর এবং য়াহয়া ইবন আবদল্লাহ আনসারী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আব্বাছ হতে বর্ণিত। নবী (স.)-এর বিবি সাওদা (রা.) বলেন, একবার আমাদের একটি বকরী মরে গেল। আমরা এর চামড়া দাবাগাত (পাকা) করলাম। এরপর থেকে তাতে সর্বদাই আমরা নবীয (খুরমা-খেজুর ভিজানো শরবত) প্রস্তুত করতাম। শেষ পর্যন্ত ওটা পুরাতন হয়ে গেল। (বুখারী 6767, আহমদ 27458)

সাওদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক লোক রসূল (স)-এ কাছে এলো। সে বলল, আমার আব্বা বৃদ্ধ। তিনি হজ্জ করতে সক্ষম না। তিনি বললেন, যদি তোমার আব্বার দেনা থাকত, অতএব তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ কর। (আহমদ 27457, শুআ্ইব আরনাউত বলেন, সহীহ)

সাওদার (রা)-এর কোন কোন কথায় রসূল (স) হেসে দিতেন। একদিন তিনি রসূল (স)-কে বললেন, কাল রাতে আমি আপনার সাথ সলাত পড়েছি। আপনি এত দীর্ঘ সময় রুকুতে ছিলেন যে, আমার নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু হয়েছে বলে মনে হয়েছিল। এ কারণে আমি দীর্ঘক্ষণ নাক চেপে ধরে রেখেছিলাম। রসূল (স) তাঁর কথায় মৃদু হেসে দেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা)

দশম হিজরীর বিদায় হজ্জে সাওদা (রা) রসূলের (স) সফরসঙ্গী ছিলেন। আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, সওদা (রাঃ) মুজদালিফার রাতে (মিনা যাওয়ার জন্য) নবী (স)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন, তিনি তাঁকে অনুমতি দেন। সওদাহ (রাঃ) ছিলেন ভারী ও ধীরগতিসম্পন্না নারী। (বুখারী ১৬৮১, মুসলিম)

রসূল (স) খায়বারে সাওদার (রা) জীবিকার ব্যবস্থা করে যান। আরাজ বলনঃ রসূল (স) সাওদাকে ৮০ ওয়াসাক খেজুর ও ২০ ওয়সাক গম বা যবের দ্বারা তাঁর জীবিকার ব্যবস্থা করেন। (ইবনে ছাদ)

বিদায় হজ্জে রসূল (স) তার বিবিদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমার পরে তোমরা ঘরে অবস্থান করবে। সাওদা (রা) এই নির্দেশের উপর এত কঠোরভাবে আমল করেন যে, হজ্জের উদ্দেশ্যেও আর কখনও ঘর থেকে বের হননি।

সাওদা (রা) বলতেন, আমি হজ্জ ও উমরা-দুটোই আদায় করেছি। এখন আল্লাহর নির্দেশ মত ঘরে বসে থাকব। (তাবাকাত, ইবনে ছাদ)

ইবন ছীরীন বর্ণনা করেছেন, একবার খলীফা উমার (রা) খাওদার (রা) কাছে একটি থলি পাঠান। তিনি বহনকারীকে প্রশ্ন করেন থলিতে কি? বলল, দিরহাম। দিরহামের থলি খেজুরের থলির মতোই-একথা বলে তক্ষণি দিরহাম মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেন। (ইছাবা 4/118)

ইবন হাজার বলেন, উমার (রা)-এর খিলাফতকালের শেষদিকে 19 হিজরী সনে সাওদা (রা)-র ইন্তিকাল হয়। রসূলের সাথে বৈবাহিক জীবনে তাঁর কোন সন্তান হয়নি। পহেলা স্বামী সাকরানের পক্ষের একটি ছেলে, যার নাম ‘আবদুর রহমান’ পারস্যের জালুলার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

**হাফছা** **বিনতে উমার (রা)**

হাফছা (রা) দ্বিতীয় খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) বেটি। মা খুজাআ গোত্রের জয়নাব বিনতে মাজউন (সাহাবী উছমান ইবন মাজউনের আপন বোন)। রসূল (স.)-এর নুবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর আগে মক্কায় জন্ম নেন। (তাহজীবুত তাহজীব)

পিতা উমার খুনাইস ইবন হুজাফার সাথে তাঁর পহেলা বিয়ে দেন। এই খুনাইস মক্কায় পহেলা আগে ইসলাম কবুলকারীদের অন্যতম। হাবশায় হিজরতকারী দ্বিতীয় দলটির সাথে হাবশায় হিজরত করেন। সেখান থেকে মক্কায় ফিরে এসে আবার স্বামীর সাথে মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় আসার কিছুকাল পরেই বিধবা হন।

ইবনু উমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, উমার ইবনু খাত্তাবের কন্যা হাফছার স্বামী খুনায়স ইবনু হুজাইফাহ সাহ্মী (রাঃ) যিনি রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সহাবী ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, মদিনা্য় ইন্তিকাল করলে হাফছাহ (রাঃ) বিধবা হয়ে পড়ল। উমার (রাঃ) বলেন, তখন আমি উছমান ইবনু আফফানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁর নিকট হাফছার কথা উল্লেখ করে তাঁকে বললাম, আপনি ইচ্ছে করলে আমি আপনার সঙ্গে উমারের মেয়ে হাফছার বিয়ে দিয়ে দেব। উছমান (রাঃ) বললেন, ব্যাপারটি আমি একটু চিন্তা করে দেখি। উমার (রাঃ) বলেন, আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। পরে উছমান (রাঃ) বললেন, আমার স্পষ্ট মত যে, এ সময় আমি বিয়ে করব না। উমার (রাঃ) বলেন, এরপর আমি আবূ বাকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি ইচ্ছা করলে উমারের কন্যা হাফছাকে আমি আপনার কাছে বিয়ে দিয়ে দেব। আবূ বকর (রাঃ) চুপ রইলেন, কোন জবাব দিলেন না। এতে আমি উছমানের চেয়েও বেশি দুঃখ পেলাম। এরপর আমি কয়েকদিন চুপ করে থাকলাম, এই অবস্থায় হাফছার জন্য রসূলুল্লাহ নিজেই প্রস্তাব দিলেন। আমি তাঁকে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলাম। এরপর আবূ বকর (রাঃ) আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, আমার সঙ্গে হাফছার বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পর আমি আপনাকে কোন উত্তর না দেয়ার কারণে সম্ভবত আপনি মনোকষ্ট পেয়েছেন। আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন আবূ বকর (রা.) বললেন, আপনার প্রস্তাবের জবাব দিতে একটি জিনিসই আমাকে বাধা দিয়েছে আর তা এই যে, আমি জানতাম, রসূলুল্লাহ্ (স.) নিজেই হাফছা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন, তাই রসূলুল্লাহর গোপনীয় বিষয়টি প্রকাশ করার আমার ইচ্ছে ছিল না। যদি তিনি তাঁকে গ্রহণ না করতেন, তাঁকে অবশ্যই আমি গ্রহণ করতাম। (বুখারী 4055)

রসূল (স.) হাফছাকে চার শো দিরহাম মোহর দান করেন।

আয়িশার (রা) সাথে বিয়ের মাধ্যমে আবু বকরের (রা) সাথে রসূলের (স.) ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কিন্তু উমারের (রা) সাথে কোন আত্মীয়তা ছিলনা। হাফছার (রা) সাথে বিয়ের মাধ্যমে এমন সম্পর্ক হয়।

রসূলের (স.) সাথে হাফছার বিয়ে কখন হয় সে বিষয়ে ইবন হাজার ইসাবা গ্রন্থে তৃতীয় সনের মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ, তাঁর পহেলা স্বামী উহুদে শহীদ হন।

সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে, হাফছার (রা) ৪৫ হিজরীর শাবান মাসে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে হাফছার (রা) বয়স হয়েছিল ৬৩ বা ৫৯ বছর।

পিতা তাঁকে গাবাতে যে ভূ-সম্পত্তি দিয়ে যান তিনি আল্লাহর রাসতায় ওয়াকফ করে দেন। হাফছা (রা) কোন সন্তান রেখে যাননি।

হাফছার (রা) সন্তানাদি না থাকলেও তিনি অনেক স্নেহভাজন নারী ও পুরুষ রেখে যান যারা তাঁর কাছে হাদীস বর্ণনাও করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইবন উমার, হামজা ইবন আবদুল্লাহ, ছাফিয়্যা বিনতে আবী উবায়দা (আবদুল্লাহর বিবি), মত্তালিব ইবন আবী ওয়াদাআ, উম্মে মুবাশশির আনসারিয়্যা, আবদুর রহমান ইবন হারেস ইবন হিশাম, আবদুল্লাহ ইবন সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা ও আরো অনেকে।

হাফছা (রা) থেকে মোট ৬০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এগুলি তিনি রসূল (স.) ও পিতা উমার (রা) থেকে শুনেছিলেন। তার বর্ণিত চারটি হাদীস মুত্তাফাক আলইহি এবং চয়টি হাদীস বুখারী হাদীস বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

তৎকালীন আরবে কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তবে পিতা উমার (রা) ও স্বামী রসূলের (স.) তত্ত্বাবধানে জ্ঞানার্জন করেন।

একবার রসূল (স.) বললেনঃ আমি আশা করি, হুদাইবিয়ায় অংশগ্রণকারীগণ জাহান্নামে যাবে না।’ হাফছা (রা) বলে উঠলেন, আল্লাহ বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে সেখানে (জাহান্নামে) পৌঁছবে না। রসূল (স.) বললেনঃ হ্যাঁ, তা ঠিক, তবে একথাও আল্লাহ বলেছেনঃ ‘‘এরপর আমি তাকওয়াশীল লোকদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।’’ (সূরা মারয়াম:৭১-৭২)

হাফছার (রা) মধ্যে শেখা ও জানার প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করে রসূলও (স.) সবসময় তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে শেখানোর চেষ্টা করতেন। মহিলা সাহাবী শিফা বিনতে আবদুল্লাহ লিখতে ও পড়তে জানতেন। হাফছা তাঁর কাছে লেখা শেখেন। (?????)

ইবন আব্বাছ (রা.) বলেনঃ “যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুকে পড়েছে তাই তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা কর। তবে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন” (সূরা তাহরীম ৬৬:৪) আয়াতটি রসুলুল্লাহ (স.) এর যে দুইজন বিবির উল্লেখ করা হয়েছে তারা কারা সে সম্পর্কে উমার (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করার জন্য আমি অনেক দিন লালায়িত ছিলাম।

শেষে উমার (রা.) একবার হজ্জ করতে গেলে আমিও তার সঙ্গে সে হজ্জে ছিলাম। একদিন তিনি উযু করছিলেন আর আমি পাত্র থেকে পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম। আমি তাকে বললামঃ হে আমিরুল মুমিনীন! (যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর কাছে তওবা কর (তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম)। কারণ তোমাদের উভয়ের অন্তর বাঁকা হয়েছে) আয়াতটিতে রসুলুল্লাহ (স.) এর যে দুই স্ত্রীর উল্লেখ করা হয়েছে তারা কারা? তিনি বললেনঃ হে ইবন আব্বাছ, আশ্চর্য! যুহরী বলেন উমার (রা.) জিজ্ঞাস্য বিষয়টি পছন্দ করেন নি, তবে তিনি বিষয়টি গোপনও করলেন না। যা হোক তিনি বললেনঃ এরা হল আয়েশা ও হাফছা। এর পর তিনি আমাকে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করা শুরু করেন। তিনি বলেন আমরা কুরায়শী সম্প্রদায় ছিলাম বিবিদের উপর প্রবল। কিন্তু মদীনায় এসে দেখলাম যে, এরা এমন এক সম্প্রদায় যাদের উপর তাদের স্ত্রীরা প্রবল। এখানে আমাদের স্ত্রীরাও তাদের আচরণ শিখতে শুরু করে। একদিন একটি বিষয়ে আমার স্ত্রীর উপর আমি রাগ করি। সে তখন আমাকে প্রত্যুত্তর দেয় তার সে প্রত্যুত্তর করাটা আমি অপছন্দ করি। তখন সে বলল আপনি মন্দ ভাবছেন কেন? আল্লাহর কসম, রসুলুল্লাহ (স.)-এর বিবিরাও তার কথার প্রত্যুত্তর করে থাকেন এবং তাদের কেউ কেউ দিন থেকে রাত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথা বন্ধ রাখেন। উমার (রা.) বললেনঃ আমি মনে মনে বললাম তাদের যে-জন এ ধরণের কাজ করে সে লাঞ্ছিত ও ধংস হবে।

উমার (রা.) বলেনঃ মদীনায় আওয়ালী অঞ্চলে বানু উমায়্যায় ছিল আমার বাস। আমার এক আনসারী প্রতিবেশী ছিলেন। রসুলুল্লাহ (স.) এর দরবারে হাযিরী প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা পালা নির্ধারণ করে নেই। তিনি এক দিন সেখানে হাজির হতেন এবং সে দিন ওহী ও অন্যান্য বিষয়ের খবরাদি আমার কাছে আনতেন। আরেক দিন আমি হাজির হতাম আর তার কাছে অনুরূপ খবরাদি নিয়ে আসতাম। তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছিল যে, গাসসানীরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য ঘোড়াগুলোতে নাল লাগিয়ে তৈরী করে রাখছে। যা হোক আমার ঐ প্রতিবেশী একদিন ইশার সময় আমার বাড়ি আসে এবং দরজায় করাঘাত করে, আমি তার কাছে বের হয়ে এলাম। তিনি বললেনঃ একটি ভীষন ব্যাপার ঘটে গেছে। আমি বললাম, গাসসানীরা কি এসে গেছে? তিনি বললেন, এর চেয়েও ভীষন ব্যাপার। রসুলুল্লাহ (স.) তাঁর বিবিদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। আমি মনে মনে বললাম হাফছা নিরাশ হল এবং ক্ষতিগ্রস্ত হল। আমারো ধারণা ছিল যে, এমন একটি বিষয় কোন দিন ঘটতে পারে। ফজর সালাত পড়ে আমি কাপড় পরলাম। রওয়ানা হয়ে হাফছা এর কাছে পৌছলাম। সে তখন কাঁদছিল। আমি বললাম রসুলুল্লাহ (স.) কি তোমাদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন? সে বললঃ আমি জানি না। তিনি ঐ চিলেকোঠায় আলাদা হয়ে আছেন। উমার (রা.) বলেন, আমি সে দিকে গেলাম। কালো একটি গোলামকে সেখানে পেলাম। বললাম, উমারের জন্য অনুমতি চাও। সে ভেতরে গেল। পরে আমার কছে বের হয়ে এল। বললঃ আপনার কথা তাকে বলেছি কিন্তু কিছুই বললেন না তিনি।

আমি মসজিদে চলে এলাম। মিম্বারের চারপাশে বসে কিছু লোক কাঁদছেন। আমি তাদের কাছে বসে গেলাম। কিন্তু পুনঃ আমার মনের উদ্বেগ প্রবল হয়ে উঠল। গোলামটির কাছে এলাম। বললাম উমারের জন্য অনুমতি নিয়ে এস। সে ভেতরে চলে গেল। এর পর আমার কাছে বের হয়ে এসে বললঃ আমি আপনার কথা তার কাছে উল্লেখ করেছি কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। আমি আবার মসজিদে চলে এলাম এবং বসে পড়লাম। পরে আবার আমার ভিতরে উদ্বেগ প্রবল হয়ে উঠল। গোলামটির কাছে এলাম এবং বললাম উমারের জন্য অনুমতি চাও। সে ভিতরে গিয়ে ফের বের হয়ে এল। বলল আপনার কথা তাকে বললাম কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না।

উমার (রা.) বলেন, আমি পিছন ফিরে চলে এলাম। এমন সময় গোলামটি আমাকে ডাকল। বলল, ভিতরে যান, তিনি আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। উমার (রা.) বলেন, আমি ভিতরে গেলাম। দেখলাম, রসুলুল্লাহ (স.) একটি বুননকৃত চাটাইয়ে ঠেস দিয়ে আছেন। চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে তাঁর দুই পার্শ্বদেশে। আমি বললাম, হে রসুলুল্লাহ, আপনি কি আপনার বিবিদের তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেনঃ না। আমি বললামঃ আল্লাহু আকবার। হে রসুলুল্লাহ, আমাদের অবস্থা যদি দেখতেন যে, আমরা কুরায়শ ছিলাম বিবিদের উপর প্রবল। কিন্তু মদীনায় এসে এমন এক সম্প্রদায় পেলাম যাদের উপর তাদের বিবিরা প্রবল। এখানে আমাদের বিবিরা তাদের আচরণ শিখতে থাকে। এক দিন কোন এক বিষয়ে আমি আমার বিবির উপর রাগ করি কিন্তু সে আমাকে প্রত্যুত্তর দেয়। আমি বিষয়টি খুবই না-পছন্দ করলাম। সে বলল আপনি কেন তা না পছন্দ করছেন? আল্লাহর কসম, রসুলুল্লাহ (স.)-এর বিবিগণও তাঁর কথার জওয়াব দেন এবং কোন কোন সময় তাদের কেউ কেউ দিন থেকে রাত পর্যন্ত কথা বন্ধ করে দেন। পরে আমি হাফছাকে বললাম তোমরা কি রসুলুল্লাহ (স.)-এর কথার প্রত্যুত্তর কর? সে বললঃ হাঁ, আমাদের কেউ কেউ দিন থেকে রাত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কর্থা বন্ধ করে থাকে। আমি বললামঃ তোমাদের মধ্যে যে এমন কাজ করে সে তো লাঞ্ছিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত। রসুলুল্লাহ (স.)- এর ক্রোধের কারণে তার উপর আল্লাহর ক্রোধান্বিত হওয়া থেকে তোমাদের কেউ কি নিজেকে নিরাপদ মনে কর? এ অবস্থায় সে ধংস হবে। তখন রসুলুল্লাহ (স.) স্মিত হাসলেন। আমি বললাম হাফছাকে বলেছি, রসুলুল্লাহ (স.) এর কথার প্রত্যুত্তর করবে না এবং তার কাছে কোন কিছু চাইবে না। তোর যা মন চায় আমার কাছেই চেয়ো। তোমর যে সখী (আয়িশা) তোমার চেয়ে সুন্দরী এবং রসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে বেশি প্রিয়, তার অবস্থা যেন তোমাকে ধোকায় না ফেলে। নবী (স.) আরেক বার স্মিত হাসলেন।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল (স.)! আমি কি আরো স্বচ্ছন্দ হব? তিনি বললেন, হাঁ। উমার (রা.) বলেন, আমি মাথা উঠালাম। সারা ঘরে তিনটা চামড়া ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না। বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আল্লাহর কাছে দুআ করুন। তিনি যেন আপনার উম্মতকে স্বচ্ছন্দ্য দান করেন। পারস্য ও রোমবাসীরা আল্লাহর ইবাদত করেনা অথচ তিনি তাদের কত বিত্ত দিয়েছেন। এ কথা শুনে রসুলুল্লাহ (স.) সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, হে খাত্তাব পুত্র! তুমি কি সন্দেহে আছ? এরা এমন সম্প্রদায় যাদের ত্বরা করে দুনিয়াবী হায়াতেই তাদের প্রতিদানসমূহ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। উমার (রা.) বলেনঃ রসুলুল্লাহ (স.) কছম করেছিলেন যে, এক মাস পর্যন্ত বিবিদের কাছে যাবেন না। এ কারণে আল্লাহ তাকে সোহাগভরে বকা দেন এবং কছমের কাফফারার বিধান দেন। জুহরী বলেনঃ উরওযা বর্ণনা করেছেন যে, আয়িশা (রা.) বলেনঃ উনত্রিশ দিন পার হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (স.) আমার কাছে এলেন এবং আমার থেকে (থাকা না থাকার এখতিয়ার প্রদান বিষয়টি) শুরু করেন। বললেন, হে আয়িশা! আমি তোমাকে একটি বিষয় বলেছি। তোমার পিতামাতার সঙ্গে পরামর্শ ছাড়া এ ব্যাপারে কোন তাড়াহুড়া করবে না। আয়িশা (রা.) বলেন, এর পর তিনি তেলওয়াত করলেন {হে নবী, তোমার স্ত্রীদেরকে বল তোমরা যদি পার্থিব জীবন এবং এর ভূষন কামনা কর তবে এস, আমি তোমাদেরকে ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তার রসূল ও আখিরাত কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। (সূরা আহজাব ৩৩:২৮-২৯)} আয়িশা (রা.) বলেনঃ তিনি জানতেন, কসম, আল্লাহ্‌ আমার পিতামাতা তাকে পরিত্যাগ করার পরামর্শ আমাকে কখন দিবেন না। আমি বললাম, এ বিষয়ে আমি আমার পিতামাতার সঙ্গে কি পরামর্শ করব? আমি অবশ্যই আল্লাহ তাঁর রসূল এবং আখিরাতের আবাসই কামনা করি। হাদীসটি হাসান সহীহ-গারীব। (সূনান তিরমিজী ৩৩১৮)

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, উমার (রা) হাফছাকে (রা) বলেন, তুমি রসূলের (স.) কথার জওয়াব দেবে না। তোমার না আছে জয়নাবের সৌন্দর্য ও আয়িশার সৌভাগ্য।

আয়িশা ও হাফছা, দুইজনের মনের এমন চমৎকার মিল এবং উভয়ের মধ্যে এত ভাব থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে স্বামীসঙ্গ ও সোহাগ প্রাপ্তির ব্যাপারে তাঁরা ঈর্ষার শিকার হতেন। একবার এক সফরে তাঁরা দুইজন রসূলের (স) সফরসঙ্গী ছিলেন। রাতে রসূল (স) আয়িশার উটের উপর সওয়ার হয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে পথ চলতেন। একদিন হাফছা আয়িশাকে বললেন, আজ রাতে তুমি যদি আমার উটের উপর, আর আমি তোমার উটের উপর সওয়ার হই তাহলে অন্য একটা দৃশ্য দেখা যাবে। আয়িশা (রা) রাজি হলেন। রসূল (স) হাফছার সাথে তাঁর বাহনে পথ চললেন। মনজিলে পৌঁছে আয়িশা যখন রসূলকে (স) পেলেন না তখন নিজের চরণ দুইখানি ইযখীর ঘাসের মধ্যে ঝুরিয়ে বলতে রাগলেনঃ হে আল্লাহ! কোন সাপ অথবা বিচ্ছু যদি আমাকে দংশন করত।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, রসূলের (স) জীবনের সকল ছোট-বড় ঘটনা সাধারণ মানুষের জীবনের মত নিছক কোন ঘটনা নয়। প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্যে রয়েছে মানবজাতির জন্য শিক্ষাণীয় বিষয়। আল্লাহ এসব ঘটনার মাধ্যমে মানব জাতিকে বিভিন্ন বিধি-বিধান ও আচরণের বাস্তব শিক্ষা দিয়েছেন।

হিজরী ৯ম সনে সূরা তাহরীম নাজিল হয়। এর পেছনে রয়েছে রসূলের (স) পারিবারিক জীবনের একটি ঘটনা। আয়িশাহ (রা) খবর দিয়েছেন যে, নবী (আসর পরবর্তী সময় হুজরাসমূহে আবর্তনকালে) জয়নাব বিনতে জাহশ (রা)-এর ঘরে অবস্থান করে সেখানে মধু পান করেন। আয়িশাহ (রা) বললেন, আমি ও হাফছাহ মিলে এরূপ পরামর্শ করলাম যে, আমাদের দু'জনের মাঝে যার কাছেই নবী আসবেন সে বলবে- “আমি আপনার মুখে মাগাফীর’-এর দুর্গন্ধ পাচ্ছি। আপনি মাগাফীর খেয়েছেন।” পরে তিনি এদের কোন একজনের কাছে গেলে সে তাকে অনুরূপ বলল। নবী বললেন, বরং আমি তো জয়নাব বিনতু জাহশের ঘরে মধু পান করেছি এবং ফের কখনো পান করব না। তখন আয়িশাহ ও হাফছাহ্ (রা) উদ্দেশ্য নাজিল হল-(অর্থঃ) “হে নবী। আল্লাহ আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন, আপনি তা হারাম করছেন কেন? থেকে যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে- আল্লাহ তোমাদের মাফ করবেন"(সূরা তাহরীম ৬৬:১-৪)। এতে “যদি তোমরা উভয়ে তাওবাহ কর (অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর) দ্বারা আয়িশাহ ও হাফছাহ্ (রা) উদ্দেশ্য। আর "যখন নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন" দ্বারা “আমি মধুপান করেছি এবং আর কখনো পান করব না উদ্দেশ্য"।(মুসলিম ৩৫৪২)

নবী পরিবারের মধ্যে এই তুচ্ছ কলহ কোন সাধারণ ব্যাপার ছিল না। মুনাফিকরা সব সময় ধান্দায় থাকত খোদ নবী পরিবার ও তাঁর বিশেষ আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে যে কোন ধরনের ফাটল ধরানোর। তারা আজওয়াজে মুতাহহারাতের এই মামুলি বিরোধের কথা জানতে পেরে আরো উস্কে দিতে পারত। তারা ভাবত আয়িশা ও হাফছার পিতা আবু বকর ও উমারকে (রা) এবার রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে দাঁড় করানো যাবে। সূরা তাহরীমের ৪র্থ আয়াতে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে, রসূল (স.)-এর পদতলে তাঁরা কন্যা কেন, নিজেদর জীবনও বিলিয়ে দিতে প্রস্ত্তত। অর্থাৎ আয়িশা ও হাফছা যদি ষড়যন্ত্র করে, আর মুনাফিকরা তা কাজে লাগায় তাহলেও আল্লাহ তাঁর নবীকে সাহায্য করবেন। আর আল্লাহর সাথে আছেন জিবরীল, ফিরিশতামন্ডলী ও সমস্ত বিশ্বের মুমিন নর-নারী।

নবী পরিবারের মনোমালিন্য ও তালাক সম্পর্কিত বর্ণনাগুলির মাধ্যমে হাফছার (রা) অনেকগুরি বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা এবং শরীয়াতের কিছু বিধান আমাকে কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমনঃ

1. তালাক একটি বৈধ কাজ। যদি সে তালাক হয় কোন প্রয়োজন বা কল্যাণের জন্য, তবে তা কামালিয়াত বা পূর্ণতার পরিপন্থী নয়।
2. খোদ আল্লাহপাক হাফছার বেশি সওম রাখা ও বেশি সলাত পড়ার সনদ দিয়ে তাঁর প্রশংসা করেছেন।
3. জান্নাতেও তিনি নবী (স.)-এর বিবি হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবেন।
4. তাকে খুশী করার জন্য নবী (স.) দুইটি হালাল বস্ত্তকে নিজের জন্য হারাম করে নেন।
5. আয়িশার (রা) বক্তব্যে জানা গেছে, তিনি ছিলেন তাঁর পিতার মত।’

6. দাম্পত্য জীবনে ছোট-খাট মনোমালিন্য স্বাভাবিক ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে নবীর (স.) আদর্শ আমাদের জন্য অনুসরণীয।

আয়িশা ও হাফছা (রা) পরস্পর সতীন হলেও তাঁদের সম্পর্ক ছিল বোনের মত। অধিকাংশ ব্যাপারে তাঁরা একে অপরের সহযোগী ছিলেন। রসূল (স) অন্তিম রোগশয্যায়। সালাতের সময় হলো। তিনি বললেনঃ আবু বকরকে লোকদের সলাত পড়াতে বল। আয়িশা (রা.) বললেনঃ আবু বকর একজন কোমল মনের মানুষ। তিনি রসূলের (স) স্থানে দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ করতে গেলে কান্নায় তাঁর বাকরুদ্ধ হয়ে যাবে, লোকেরা কিছুই শুনতে পাবে না-একথাগুলি তিনি হাফছাকে বললেন এবং তাঁর স্থলে উমারকে নির্দেশ দানের জন্য রসূল (স) কে বলতে তাঁকে অনুরোধ করলেন। আয়িশার (রা) কথামত হাফছা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতেই তিনি মন্তব্য করলেনঃ ‘তোমরা সবাই ইউসুফের সাথীদের মত।

রসূলের (স.) ইন্তিকালের পর হাফছা (রা) জনগণেল পক্ষে বিভিন্ন দাবী নিয়ে খলীফাদের সাথে, বিশেষত তাঁর পিতা দ্বিতীয় খলীফা উমারের (রা) সাথে কথা বলতেন। অনেক সময় খলীফাও তার মেয়ের পরামর্শ নিতেন। এ রকম কিছু ঘটনা সীরাতের গ্রন্থাবলীতে দেখা যায়।

একবার তিনি খলীফা উমার (রা)-কে তাঁর পোশাক ও খাদ্যের মান বাড়ানোর জন্য আবেদন জানিয়ে বললেনঃ আল্লাহ এখন মুসলিমদের জীবিকায় আগের চেয়ে প্রশস্ততা দান করেছেন। উমার (রা) তাঁর মেয়েকে রসূল (স.)-এর জীবনের কঠিন বাস্তবতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে খুব কাঁদলেন।

খলীফা উমার (রা) একদিন রাতের বেলা কাবা তাওয়াফ করা অবস্থায় এক মহিলাকে করুণ সুরে একটি বিরহ সঙ্গীত গাইতে শুনলেন। যার দুইটি পংক্তি এই রকমঃ

-এই রাত দীর্ঘ ও বিস্তৃত হয়েছে, চতুর্দিক ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেছে। একাকী আমি জেগে আছি, পাশে কোন প্রিয়জন নেই যার সাথে প্রেমালাপ করতে পারি।

-আল্লাহ-যিনি অতুলনীয়, যদি তাঁর ভয় না থাকত, তাহলে এই শয্যাধারের চারপাশ অবশ্যই কম্পিত হত।

উমার (রা) মহিলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার কি হয়েছে? মহিলা বলল, কয়েক মাস যাবত আমার স্বামী আমার থেকে দূরে আছে। তাঁকে কাছে পাওয়ার অনুভূতি আমার মধ্যে তীব্র হয়ে উঠেছে। তারপর উমার (রা) মেয়ে হাফছা (রা.)-এর কাছে গিয়ে বলেন, আমি তোমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে চাই, আমাকে তুমি সাহায্য কর। মেয়েরা স্বামী থেকে দূরে থাকলে কতদিন পর স্বামীকে কাছে পাওয়ার অনুভূতি তীব্র হয়ে ওঠে? হাফছা লজ্জায় মাথানত করে ফেলেন। উমার বললেনঃ আল্লাহ সত্য প্রকাশের ব্যাপারে লজ্জা করেন না। তখন হাফছা হাত দিয়ে ইশারা করে তিন অথবা চার মাস বুঝিয়ে দেন। তখন উমার (রা) নির্দেশ দেন, কোন সৈনিককে যেন চার মাসের অধিক আটকে রাখা না হয়।

তিনি সব রকমের মতবিরোধকে অপছন্দ করতেন। সিফফীন যুদ্ধের পর যখন দুমাতুল জান্দালে শালিশ-ফয়সালার বিষয়টি এলো তখন তাঁর ভাই ইবন উমার (রা) তা একটি ফিতনা ফাসাদ মনে করে ঘর থেকে বের হতে চাইলেন না। কিন্তু হাফছা তাঁকে বললেন, এতে অংশগ্রহণে তোমার কোন লাভ নেই, তবে তোমার অংশগ্রহণ করা উচিত। কারণ, মানুষ তোমার মতের অপেক্ষায় থাকবে। এমনও হতে পারে, তোমার এই দূরে থাকা তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেনঃ উম্মতে মুহাম্মদীর মধ আপোষ-মীমাংষা হতে পারে এমন কোন বিয়ষ থেকে দূরে থাকা সমীচীন নয়। তুমি রসূলের (স.) শ্যালক এবং উমারের ছেলে।

হাফছা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেনঃ প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য জুমুআর সালাত আদায় করা একান্ত কর্তব্য এবং যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযের জন্য গমন করবে তাঁর জন্য গোসল করা প্রয়োজন। (আবু দাউদ 342)

হাফছা (রাঃ) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (স.)-কে তার নফল সালাত বসে বসে আদায় করতে কখনো দেখিনি তার ইনতিকালের এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত। এরপর তিনি বসে বসেও নফল সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন তখন তা তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করতেন, তাতে দীর্ঘ সূরা আরো দীর্ঘ হত। (মুআত্তা, সহীহ মুসলিম 1212, নাছায়ী 1658, তিরমিযী ৩৭৪)

# ****জয়নাব বিনতে খুজায়মা (রা)****

জয়নাব বিনতে খুজায়মা হিলালিয়্যা ছিলেন বনু বাকর ইবন হাওয়াযিনের কন্যা। ইবন হিশাম বলেন, মিসকীনদের প্রতি তাঁর দয়ার কারণে তাঁকে ‘উম্মুল মাসাকীন’ বা মিসকীনদের মা বলা হত। ইবন হাজার (রা) বলেনঃ তিনি গরীব-মিসকীনদের আহার করাতেন এবং তাদেরকে দান করতেন, এ কারণে তাঁকে উম্মুল মাসাকীন’ বলা হত।’ ইবন আবদিল বার ও বালাজুরী বলেন, জাহিলী যুগেই তাঁকে এ নামে ডাকা হত।

বালাজুরী, ইবনুল কালবী এবং জুরজানীর মতে, জয়নাব বিনতে খুজায়মা (রা)-এর পহেলা স্বামী ছিলেন তুফইল ইবন হারিছ। তুফাইল তালাক দিলে তার ভাই উবায়দা ইবন হারিছ তাঁকে বিয়ে করেন। বদরে তিনি আহত হয়ে সাফরাতে মারা যান। তবে ইবন আবদল বার ও ইবনুল আসীরের মতে, রসূল (স.)-এর সাথে বিয়ের অব্যবহিত আগে তিনি আবদুল্লাহ ইবন জাহাশের বিবি ছিলেন। হিজরী তৃতীয় সনে সংঘটিত উহুদ যুদ্ধে ইবন জাহাশ শাহীদ হন। তারপর রসূল (স.) তৃতীয় হিজরীর রমাজান মাসে তাঁকে বিয়ে করেন। ইবন হাজার (রা) বলেন, হাফছা (রা)-এর পরে রসূল (স.) জয়নাব বিনতে খুজায়মাকে (রা) ঘরে আনেন।

ইবন হিশাম বলেন, চার শো দিরহাম দেন মাহরের বিনিময়ে রসূল (স.) তাঁকে বিয়ে করেন। রসূলের (স.) সাথে বিয়ের পর, দুই অথবা তিন মাস জীবিত ছিলেন। রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় জান্নাতবাসিনী হন। রসূল (স.) তাঁর জানাজার সলাত পড়ান এবং মদীনার বাকী গোরস্থানে দাফন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল তিরিশ বছর।

# ****উম্মে হাবীবা (রা)****

উম্মে হাবীবা (রা) কুরাইশ নেতা আবু ছুফিয়ানের বেটি। ইসলামপূর্ব মক্কার কুরাইশদের তিন ব্যক্তি- উতবা, আবু জাহল ও আবু ছুফিয়ান খুব দাপটের নেতা ছিলেন। আবু ছুফিয়ান ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী। শাম, রোম ও আজমে তিনি বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে যেতেন। উম্মে হাবীবা (রা)-এর মা ছাফিয়্যা বিনত আবীল আছ - উছমান ইবন আফফান (রা)-এর ফুফফী। হিন্দা ছিলেন উম্মে হাবীবার সৎমা। রসূলের (স) নুবুওয়াত প্রাপ্তির সতেরো বছর আগে উম্মে হাবীবা (রা) মক্কায় জন্ম নেন।

আবু ছুফিয়ান, তাঁর বিবি হিন্দা ও তাঁর খান্দানের অধিকাংশ মানুষ মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিম হন। আবু ছুফিয়ান বলেন, আল্লাহ আমার অন্তরে ঈমান প্রবেশ করান। (বুখারী ৭)

পিতৃ-পরিবার ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী থাকলেও উম্মে হাবীবা (রা) ও ফারিআ (রা)-এর স্বামীর পরিবার ইসলামের সূচনা আগেই মুসলিম হয়ে যায়। তাঁরাও তাঁদের স্বামীদের সাথে ইসলাম কবুল করেন।

উম্মে হাবীবা (রা) ও তার স্বামী মক্কার কাফিরদের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য হাবশায় হিজরত করেন। স্বামী মারা যায়। এ খবর মদীনায় রসূলের (স) কানে পৌঁছল। উম্মে হাবীবা (রা)-এর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর রসূল (স) মদীনা থেকে আমর ইবন উমাইয়্যা দামরী (রা)-কে নাজ্জাশীর কাছে পাঠান এবং তার সাথে উম্মে হাবীবার বিয়ের কাজ সমাধা করে দেয়ার জন্য নাজাশীকে লেখেন (মুস্তাদরাক 6838)

উম্মে হাবীবা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি ইবন জাহশের বিবি ছিলেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং এই সময় হা্বশাতে যাঁরা হিজরত করেন, তিনি তাঁদের সাথে ছিলেন। তখন হা্বশার বাদশাহ্ নাজ্জাশী তাঁকে তাঁদের থাকাবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সাথে শাদী দেন। (আবু দাউদ ২০৮২)

উম্মে হাবীবা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স.) তাকে শাদী করেন যখন তিনি হা্বশাতে ছিলেন। নাজাশী তার জন্য শাদীর আয়োজন করেন এবং তাকে চার হাজার (দিরহাম?) মোহর দেন, তিনি তার নিজ সম্পদ থেকে তাকে সজ্জিত করেন এবং শুরাহবীল ইবন হাসানা (রা)-এর সাথে তাকে পাঠিয়ে দেন। Messenger of Allah did not send her anything, and the dowry of his wives was four hundred Dirhams. (নাছায়ী 3350 জঈফ)

রসূল (স)-এর সাথে উম্মে হাবীবা (রা)-এর বিয়ে হিজরী ৬, মতান্তরে ৭ সনে সম্পন্ন হয়। তখন উম্মে হাবীবার বয়স ৩৬ বা ৩৭ বছরে।

ইবন হাজম (রা) দাবী করেছেন যে, উম্মে হাবীবা (রা)-এর আকদ হাবশায় হওয়ার ব্যাপারে ইজমা হয়েছে।

ইবনু আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, মুসলিমরা আবূ ছুফিয়ানের প্রতি দৃষ্টি দিত না এবং তার সাথে উঠা-বসা করত না। তখন তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন, হে আল্লাহর নবী! তিনটি জিনিস আমাকে দিন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (আবূ ছুফিয়ান) বললেনঃ আমার কাছে আরবের সবচেয়ে উত্তম ও সুন্দরী উম্মে হাবীবাহ বিনতু আবূ ছুফিয়ান আছে, তাকে আমি আপনার সাথে বিয়ে দিব। রসূলুল্লাহ বললেনঃ হ্যাঁ। আবূ ছুফিয়ান ফের বললেন, আমার বেটা মুআবিয়াহকে আপনি ওহী লেখক নিযুক্ত করুন। রসূলুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ। আবূ ছুফিয়ান বললেন, আমাকে কাফিরদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিন, যেমন আমি (ইসলাম কবুলের আগে) মুসলিমদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করেছিলাম। তিনি বললেন, আচ্ছা। (সহীহ মুসলিম ২৫০১)

ইবন সাদ, ইবন হাজম, ইনুল জাওযী, ইবনুল আসীর, বায়হাকী, আবদুল আজীম মুনজির প্রমুখ মুহাদ্দিসীন মুসলিমের উপরোক্ত বণনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা মনে করেন, এটা বর্ণনাকারীর একটি ধারণা মাত্র।

হুদায়বিয়ার সন্ধির একটি ধারা অনুযায়ী মক্কার পার্শ্ববর্তী খুজাআ গোত্র মদীনার মুসলিমদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। এতে কুরাইশরা এই চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের উপর অত্যাচার চালান। খুজাআ রসূল (স)-এর সাহায্য চাইল। এতে মক্কার কুরাইশরা শঙ্কিত হয়। তারা সন্ধিচুক্তি বলবৎ রাখার জন্য তাদের পক্ষ থেকে আবু ছুফিয়ানকে মদীনায় পাঠায়। আবু ছুফিয়ান মদীনায় এসে প্রথমে কন্যা উম্মে হাবীবা (রা)-এর কাছে যান। কন্যা পিতাকে দেখে রসূল (স)-এর বিছানা গুটিয়ে বসতে দেন। আবু সুফইয়ান মেয়েকে প্রশ্ন করেন, মেযে! তুমি বিছানা গুটিয়ে নিলে। তা বিছানা আমার বসার উপযুক্ত মনে না করে, না আমাকে বিছানার উপযুক্ত মনে না করে? মেযে বললেন, এটা রসূল (স)-এর বিছানা। আর আপনি একজন মুশরিক (অংশীবাদী) ও অপবিত্র। এ কারণে আমি ইচ্ছা করিনি যে, আপনি রসূল (স)-এর বিছানায় বসুন। মেয়ের এমন কথা শুনে আবু ছুফিয়ান সেখানে থেকে উঠে রসূলের (স) কাছে গিয়ে বসেন এবং মেয়েকে বলেনঃ আমাকে ছাড়ার পর তোমার মধ্যে অনেক মন্দ ঢুকেছে। [ইবনে হিশাম 4/55]

ইবন সাদের একটি বর্ণনায় এসেছে উম্মে হাবীবার (রা) বিয়ের খবর মক্কায় আবু ছুফিয়ানের কাছে পৌঁছে। তবে তিনি এ বিয়েকে অপছন্দ করেননি। তিনি মন্তব্য করেনঃ -এ এমন সম্ভ্রান্ত কুফু যা প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

উম্মে হাবীবা (রা) হিজরী ৪৪ মতান্তরে ৪২ সনে মদীনায় ইনতিকাল করেন। তাকে মদীনায় দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

মৃত্যুর আগে তিনি আয়িশা (রা) ও উম্মে সালামা (রা) কে ডেকে আনান। তিনি তাঁদেরকে বলেন, আমার ও আপনাদের মধ্রে তেমন সম্পর্ক ছিল, যেমন সতীনদের পরস্পরের থাকে। যেহেতু আপনারা তেমন চেয়েছিলেন, তাই আমিও তাই পছন্দ করেছিরাম। আপনারা আমার মাগফিরাতের জন্য দুআ করুন। আয়িশা (রা) তাঁর মাগফিরাতের জন্য দুআ করলে তিনি খুশী হয়ে বলেনঃ আপনি আমাকে খুশী করেছেন, আল্লাহ আপনাকে খুশী করুন।

পহেলা স্বামীর ঔরসে দুইটি সন্তান আবদুল্লাহ ও হাবীবা জন্ম নেয়। হাবীবা রসূল (স)-এর ঘরে তাঁরই তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। ছাকীফ গোত্রের এক নেতার সাথে তার বিয়ে হয়।

হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে উম্মে হাবীবার (রা) পয়ষট্টিটি (৬৫) হাদীস সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে দুইটি হাদীস মুত্তাফাক আলাইহি এবং দুইটি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সূত্রে যে সকল রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন: হাবীবা (কন্যা), মুআবিয়া, উতবা (আবু ছুফিয়ানের দুই ছেলে), আবদুল্লাহ ইবন উতবা, আবু সুফইয়ান ইবন সাঈদ সাকাফী, সালিম ইবনসাওয়ার, আবুল জাররাহ, ছাফিয়্যা বিনত শায়বা, জয়নাব বিনতে উম্মে সালামা, উরওয়া ইবন যুবাইর, আবু সালিহ, শাহর ইবন হাওশাব, আনবাসা, শুতাইর ইবন শাকাল, আবুল মালীহ আমির হুজালী প্রমুখ।

জয়নাব বিনত আবূ সালামা (রাঃ) বলেনঃ নবী (স.)-এর বিবি উম্মে হাবীবার পিতা আবূ সুফিয়ান ইবনু হারব মূত্যুবরণ করলে আমি তাঁর কাছে যাই। উম্মে হাবীবা (রাঃ) জাফরান ইত্যাদি মিশ্রিত হলদে রং এর খোশবু নিয়ে আসতে বললেন। তিনি এক বালিকাকে এ থেকে কিছু মাখালেন! এরপর তার নিজের চেহারার উভয় পাশে কিছু মাখলেন। এরপর বললেনঃ আল্লাহর কসম! খোশবু ব্যবহার করার কোন দরকার আমার নেই। তবে আমি রসুলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা বৈধ হবে না। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে পারবে। (বুখারী)

উম্মে হাবিবা (রাঃ) বলেন, নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি দৈনিক বার রাকাত নফল সালাত পড়বে, আল্লাহ্ তাঁর জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (আবু দাউদ 1250)

উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে দলের পশুর গলায় ঘণ্টা থাকে রাহমাতের (ফিরিশতা) তাদের সঙ্গী হয় না. [আবু দাউদ 2554]

উম্মে হাবিবা (রাঃ) বলেন, নবী (স) বলেন, যদি আমার উম্মতের জন্য বেশি কষ্ট মনে না করতাম তবে প্রতি সালাতের আগে মিছওয়াক করার নির্দেশ দিতাম. (আহমদ 26223)

উম্মে হাবীবা (রা) অত্যন্ত শক্ত ঈমানদার মহিলা ছিলেন। তিনি যে যুগের মহিলা, সে অনুপাতে যে ধৈর্য, দূঢ়তা ও বিচকষণতা দেখিয়েছেন, তা ভেবে দেখলে বিম্মিত না হয়ে পারা যায় না। ইসলামের আবির্ভাবকালেই তিনি স্বীয় মেধা ও বুদ্ধি দ্বারা সত্যকে চিনতে পেরে আঁকড়ে ধরেন। যে কাজ সে সময়ের অনেক বড় বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা করতে পারেনি, বা করতে যাদের অনেক সময় লেগেছে, তিনি সহজেই তা করতে পেরেছেন। সত্যের জন্য তিনি মা-বাবা, ভাই-বোনসহ সকল আত্মীয় বন্ধুদের ছেড়ে দেশ ত্যাগ করেছেন। তিনি তাঁর বিশ্বাসের উপর অটল থাকলেন।

মজবুত ঈমানের সাথে আল্লাহর রাসূলের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসাও তাঁর অন্তরে ছিল। আল্লাহর রসূল (স) কে তিনি যে কত বড় ও পবিত্র বলে জানতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর মুশরিক পিতাকে রসূল (স)-এর বিছানায় বতে না দেওয়ার মাধ্যমে। তিনি পিতার মুখের উপর বলে দিলেন, আপনি মুশরিক, অপবিত্র। আমি চাই না আপনি আল্লাহর রসূলের (রা) বিছানায় বসে অপবিত্র করুন।

ইবন আব্বাছ (র) বলেন, রসূল (স) যখন উম্মে হাবীবা (রা)কে বিয়ে করেন তখন নিম্নের এ আয়াতটি নাজিল হয়ঃ ‘যারা তোমাদের শত্রু আল্লাহ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সম্ভাবত বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন।’(মুমতাহিনা-৭)

# ****জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিছ (রা)****

জুওয়াইরিয়া (রা) খুজাআ গোত্রের ‘মুসতালিক’ শাখার গোত্রপতি হারিছ ইবন দিরারের কন্যা। জুওয়াইরিয়ার (রা) পহেলা বিয়ে হয় তাঁরই গোত্রের মুসাফি ইবন সাফওয়ান (জী শুফার) নামের এক ব্যক্তির সাথে। পিতা হারিছ ও স্বামী মুসাফি উভয়ে ছিলেন ইসলামের চরম দুশমন।

আর বনু খুযাআ গেত্রের একটি পানির কূপের নাম মুরাইসী। হিজরী পঞ্চম সনে রসূল (স) খবর পেলেন যে, হারিছ ইবন দিরার মক্কার কুরাইশদের প্ররোচনায় নিজের ও অন্য আরব গোত্রের লোকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণের তোড়জোড় শুরু করেছে। রসূল (স) খবরটির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বুরাইদা আসলামী (রা)-কে পাঠালেন। তিনি সেখানে পৌঁছে সরাসরি হারিসের সাথে কথা বলে বুঝলেন, ঘটনা সত্য। তিনি সাথে সাথে ফিরে এসে রসূল (স)-কে প্রকৃত অবস্থা জানালেন।

শাবান মাসের 3 তারিখ রসূল (স) নিজেই বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে বের হন এবং মদীনা থেকে নয় মনজিল দূরে মুরাইসী পৌঁছে কূপের কিনারে অবস্থান করেন। হারিসের নেতৃত্বে হঠিত কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনীর কাছে সব খবর পৌঁছে গেল। তারা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ল। নেতা হারিছ পালিয়ে যায়। অন্যান্য আরব গোত্র প্রতিরোধের ইচ্ছা ত্যাগ করে যার যার মত বিক্ষিপ্ত হয়ে ভাগে। শক্রুপক্ষের পুরুষ-নারী-শিশু মিলে প্রায় ৬০০ জন বন্দী হয় এবং তাদের দুই হাজার উট, পাঁচ হাজার ছাগল-ভেড়া গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) হিসেবে মুসলিম বাহিনী লাভ করে।

এই যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে জুওয়াইরিয়াও (রা) ছিলেন। সকল যুদ্ধবন্দীকে দাস-দাসী ঘোষনা করে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। জুওয়াইরিয়া (রা) পড়ন সাবিত ইবন কায়সের (রা) ভাগে।

আইশা (রাঃ) বলেন, জুয়ায়রিয়া বিনত হারিছ ইবন মুসতালিক, ছাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাশ, অথবা তাঁর চাচাতো ভাইয়ের অংশে (যুদ্ধবন্দী হিসাবে) পড়েন। তিনি নিজেকে মুকাতির দাসী হিসাবে সাবস্ত করেন তিনি একজন সুন্দরী, সুশ্রী ছিলেন, যা প্রত্যেকের জন্য আকর্ষণীয় ছিল। আইশা (রা.) বলেন, তিনি রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে তার মুক্তিপণের টাকার জন্য আবেদন করার উদ্দেশ্যে আসেন। তিনি যখন দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন, তখন তাকে দেখে আমার খুব খারাপ লাগল। কেননা আমার মনে হচ্ছিল, রসূলুল্লাহ তার সে সৌন্দর্য দেখবেন, যা আমি দেখেছি। তখন জুয়ায়রিয়া বলেন, হে রসূলাল্লাহ, আমি জুয়ায়রিয়া বিনত হারিছ। আর আমার ব্যাপারটি আপনার কাছে গোপন নয়। আমি (যুদ্ধবন্দী হিসাবে) ছাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাশের ভাগে পড়েছি, আর আমি তাঁকে মুক্তিপণ দিয়ে বন্ধনমুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করেছি। এজন্য আমি আমার মুক্তিপণের টাকার প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি। তখন রসূলুল্লাহ বলেনঃ তুমি কি এর চাইতে উত্তম কোন ব্যাপারে সন্মত আছ? সে বলে, তা কি হে রসূলাল্লাহ? তিনি বলেন আমি তোমার পক্ষ হতে তোমার যাবতীয় মুক্তিপণ আদায় করে দেব এবং তোমাকে বিয়ে করব। তখন জুয়ায়রিয়া বলেন, আমি এতে রাজী আছি। আইশা (রা.) বলেন লোকেরা যখন শুনল যে, রসূলুল্লাহ (স.) জুয়ায়রিয়াকে বিয়ে করেছেন, তখন তাদের হাতে বনু মুসতালিকের যত বন্দী ছিল, সকলকে মুক্ত করে দেয় এবং তারা বলেন এরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর শ্বশুর বংশের লোক। (আইশা বলেন,) আমি তাঁর চাইতে ভাগ্যবতী আর কাউকে দেখিনি, যার কারণে তাঁর কওমের লোকেরা এত উপকৃত হয়েছে! কেননা, তাঁর জন্যই বনূ মুসতালিকের একশত বন্দী মুক্তি পায়। (আবু দাউদ 3931)

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, জুওয়াইরিয়া (রা) রসূল (স)-এর বিবি হিসাবে ঘর করা শুরু করেছেন। পিতা হারিছ তা জানতেন না। তিনি বেটিকে মুক্ত করার জন্য অনেকগুলি উটের উপর মুক্তিপণের অর্থ সম্পদ বোঝাই করে মদীনার দিকে যাত্রা করেন। পথে আকীক উপত্যকায় পৌঁছে উটগুলি চরানোর জন্য লাগামমুক্ত করে দেন। সেই উটগুলির মধ্যে দুইটি উট ছিল তাঁর অতি প্রিয়। এ কারণে তিনি উট দুইটি একটি গোপন স্থানে বেঁধে রাখেন। এরপর তিনি মদীনায় রসূল (স.)-এর দরবারে পৌঁছে বলেন ‘আপনি আমার কন্যাকে বন্দী করে নিয়ে এসেছেন। এই নিন তার মুক্তিগণ এবং তাকে আমার সাথে যাওয়ার অনুমতি দিন।’ তাপর তিনি যে অর্থ-সম্পদ, উট ইত্যাদি নিয়ে এসেছিলেন, এক এক করে সবই উপস্থাপন করতে লাগলেন। তখন রসূল (স) তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, ‘সেই উট দুইটি কোথায়, যাদেরকে আকীক উপত্যকায় লুকিয়ে রেখে এসেছ? রসূল (স)-এর এই অবগতিতে হারিছ বিম্মিত হলেন। তিনি সাথে সাথে কালেমা পাঠ করে মুসলিম হন। (ইবনে হিশাম)

তারপর তিনি জানতে পারলেন যে, যাঁকে মুক্ত করতে তিনি ছুটে এসেছেন, তিনি এত দিনে নবীগৃহের শোভায় পরিণত হয়েছেন। তিনি কন্যার এমন সৌভাগ্যে দারুণ পুলকিত হলেন এবং অত্যন্ত আনন্দের সাথে কন্যার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর খুশী মনে তাঁকে সাথে নিয়ে নিজ গোত্রের বাসভূমির দিকে যাত্রা করলেন।

জুওয়াইরিয়া (রা) রসূলের (স) সাতটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্রে ইমাম বুখারী একটি ও মুসলিম দুইটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছে যাঁরা হাদীস শুনেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেনঃ ইবন আবস, জাবির, ইবন উমার, উবাইদ ইবন সাবাক, তুফাইল, আবু আইউব মুরাগী, মুজাহিদ, কুরাইব, কুলসুম ইবন মুসতালিক প্রমুখ।

জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা.) বলেন, নবী (স.) জুমুআর দিনে তাঁর কাছে আসেন তখন তিনি (জুয়াইরিয়া) সওম পালনরত ছিলেন। আল্লাহর রসূল (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি গতকাল সওম পালন করেছিলে? তিনি বললেন, না। আল্লাহর রসূল জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আগামীকাল সওম পালনের ইচ্ছা রাখ? তিনি বললেন, না। আল্লাহর রসূল বললেনঃ তাহলে সওম ভেঙ্গে ফেল। (বুখারী ১৯৮৬, আহমদ 26879)

নবী (স.)-এর বিবি জুওয়রিয়্যা (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) তাঁর ঘরে প্রবেশ করে বললেন, কিছু খাবার আছে কি? তিনি বললেন, না। আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রসুল! আমার কাছে কোন খাবার নেই। তবে বকরীর কিছু হাড্ডি আছে যা আমার আজাদকৃত দাসীকে সাদাকা হিসাবে দেয়া হয়েছিল। একথা শুনে তিনি বললেন, তা আমার কাছে আন। বস্তুত সাদাকা তার নিজ স্থানে পৌঁছে গিয়েছে। (قربيه فقد بلغت محلها)(সহীহ মুসলিম ??, আহমদ 26878)

জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা.) বলেন, নবী (স.) বলেন, যে রেশমের পোশাক পরে আল্লাহ তাকে আগুনের পোশাক পরাবেন। ([من لبس ثوب حرير ألبسه الله ثوبا من النار يوم القيامة](http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=6&ID=1154&idfrom=25532&idto=25535&bookid=6&startno=2#docu)) (আহমদ 26217)

জুওয়ায়রিয়া (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ প্রত্যূষে তাঁর কাছ থেকে বের হলেন। যখন তিনি ফজরের সালাত পড়লেন তখন তিনি সালাতের জায়গায় ছিলেন। এরপর তিনি দুহা’র পরে ফিরে এলেন। তখনও তিনি বসেছিলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম তুমি সেই অবস্থায়ই আছ। তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবী বললেনঃ আমি তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর চারটি কালেমা তিনবার পড়েছি। আজকে তুমি এ পর্যন্ত যা বলেছ তার সাথে ওজন করলে এই কালেমা চারটির ওজনই বেশী হবে। কালেমাগুলো এই- "আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি তার অগণিত সৃষ্টির সমান, তার সন্তুষ্টি, তার আরশের ওজনের পরিমাণ ও তার কালেমার সংখ্যার পরিমাণ।" (মুসলিম 2726, তিরমিজী 3555)

রসূল (স) খায়বারে উৎপন্ন ফসল থেকে আশি ওয়াসাক খেজুর এবং বিশ ওয়াসাক যব বা গম জুওয়াইরিয়া (রা)- এর জীবিকার জন্য নির্ধারণ করেন। (তাবাকাত ইবনে ছাদ)

হিজরী ৫ম সনে রসূল (স)-এর সাথে বিয়ের সময় জুওয়াইরিয়া (রা)-এর বয়স ছিল বিশ বছর। (মুস্তাদরাক) ইবনুল জাওজীর মত অনুযায়ী হিজরী ৫০ সনের রবিউল আওয়াল মাসে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ৬৫ বছর। তাঁর কবর মদীনার বাকী গোরস্তানে।

# ****মায়মূনা বিনতে হারিছ (রা)****

উম্মুল মুমিনীন হাফছার (রা) পরে রসূল (স) মায়মূনা বিনতুল হারিছ হিলালিয়্যাকে (রা) বিয়ে করেন। ইনিই সেই মহিলা যাকে রসূল (স) সর্বশেষ বিয়ে করেন (ইবন সাদ) তাঁর পিতা হারিছ ইবন হাজন এবং মাতা হিন্দা বিনত আওফ।

মায়মূনা (রা) কুরাইশ গোত্রের মেয়ে। আরবের অনেক বড় নামী-দামী বংশ ও ঘরের সাথে ছিল তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্কে। তাঁর এক বোন উম্মুল ফাজল লুবাবা ছিলেন আববাস (রা)-র বিবি। তাঁর দ্বিতীয় বোন লুবাবা সুগরা ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালীদের (রা) মা। তৃতীয় বোন বায়জা ছিলেন ইয়াযীদ ইবনুল আসাম-এর মা। ৪র্থ বোন উম্মে হাফীদ হাজীলা।

বিয়ে: ইবন হাজার বলেছেন যে, রসূল (স)-এর আগে মায়মূনা (রা) আবু রুহমের বিবি ছিলেন। হিজরী ৭ম সনে আবু রুহমের মৃত্যু হলে রসূলের (স) বেগমের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি ছিলেন রসূলের (স) সর্বশেষ বেগম। উমরা আদায়ের পর মদূীনা ফেরার পথে মক্কা হতে ছয় থেকে বারো মাইল দূরে ‘সারাফ’ নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করেন। এদিকে রসূল (স)-এর খাদেম আবু রাফে মায়মূনাকে (রা) নিয়ে সেখানে হাজির হন। এই ‘সারাফে’ রসূল (স)-এর জন্য নির্মিত খীমায় মায়মূনা (রা) রসূল (স)-এর সাথে মিলিত হন। (ইবন হিশাম)

রসূল (স)-এর সাথে মায়মূনার (রা) বিয়ে সম্পন্ন হয় আব্বাছ (রা) অভিভাবকত্বে। রসূল (স) হিজরী ৭ম সনে উমারাতুল কাজা আদায়ের উদ্দেশ্যে যখন মক্কার দিকে বেরিয়ে পড়নে তখন জাফর (রা)-কে বিয়ের পয়গামসহ মক্কায় অবস্থানরত মায়মূনার (রা) কাছে পাঠান। তিনি আববাছ ইবন আবদিল মুত্তালিবকে (রা) উকিল নিয়োগ করেন।

মায়মূনা (রাঃ) বলেন, রসুল (স) আমাকে সারিফ নামক জায়গায় বিবাহ করেন এবং সময় তখন আমরা ঊভয়েই হালাল অবস্থায় ছিলাম। (আবু দাউদ 1843)

আবু রাফে বলেন, রসূল (স) বিয়ের সময় হালাল অবস্থায় বিয়ে করেন (ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না) এবং হালাল অবস্থায় বাসর করেন আর আমি ছিলাম দূত । (দারেমী .....)

সাঈদ ইবনুল মুস্যায়্যাব (রহঃ) বলেন, রাসুল (স) কর্তৃক মায়মূনা (রাঃ)-কে ইহরাম অবস্থায় বিয়ে হওয়ার বিষয়ে ইবন আব্বাছ (রাঃ) সন্দেহে পড়েছেন। (আবু দাউদ 1845)

উছমান ইবনু আফফান (রাঃ) থেকে রসুলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ (হজ্জ বা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে) ইহরামধারী ব্যক্তি নিজেও বিবাহ করবে না, অন্যকেও বিবাহ করাবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না। (মুসলিম 3512, আবু দাউদ 1841, দারেমী 1823)

আয়িশা (রা) মায়মূনার (রা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেনঃ আমাদের মধ্যে মায়মূনা সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করতেন এবং সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখতেন।

তিনি খুব পরিচ্ছন্ন বিশ্বাস ও শুদ্ধ ধ্যান-ধারণার মহিলা ছিলেন। বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে তাঁর স্বচ্ছ চিন্তা-বিশ্বাসের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন, একবার এক মহিলা অসুস্থ অবস্থায় মানত মানেন যে, আল্লাহ তাকে সুস্থ করলে বায়তুল মাকদাসে গিয়ে সলাত পড়বেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি সুস্থ হন। এখন তিনি মান্নত পূর্ণ করতে বায়তুল মাকদাসে যাবেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি মায়মূনা (রা)-এর কাছে বিদায় নিতে আসেন। মায়মূনা (রা) তাঁকে বুঝালেন যে, মসজিদে নববীতে সলাত পড়ার সওয়াব অন্য মসজিদের চেয়ে হাজার গুণ বেশি। সুতরাং তুমি সেখানে না গিয়ে এখানে থাক।

তিনি মাঝে মধ্যে ধার-করজ করতেন। একবার একটু বেশি ধার করে ফেললেন। তাই কেউ একজন বললেন, এত ধার শোধের উপায় কি হবে? তিনি বললেন, রসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি শোধ করার ইচ্ছা রাখে, আল্লাহ নিজেই তা শোধ করে দেন।

মায়মূনার (রা) মধ্যে ছিল দাস মুক্ত করার প্রবল আগ্রহ। একবার একটি দাসীকে মুক্তি দিলে রসূল (স) বলেন, এতে তুমি অনেক সাওয়াব অর্জন করেছ।

শরীয়তের আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে ভীষণ কঠোর ছিলেন। এ ব্যাপারে কোন রকম নমনীয়তা তাঁর মধ্যে ছিল না। একবার তাঁর এক কাছে আত্মীয় দেখা করতে আসে। তার মুখ দিয়ে তখন মদের গন্ধ বের হচ্ছিল। তিনি লোকটিকে শক্ত ধমক দেন। তাকে আর কখনও তাঁর কাছে না আসার জন্য শক্তভাবে বলে দেন।

ইবনুল জাওজীর মতে মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৭৬টি। মায়মূনা (রা)-এর কাছে থেকে যাঁরা হাদীস বণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেনঃ ইবন আব্বাছ, আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ ইবনুল হাদ, আবদুর রহমান ইবনুস সায়িব, ইয়াযীদ ইবন আসাম, (তাঁরা সবাই তাঁর বোনের ছেলে), উবায়দুল্লাহ খাওলানী, নাদবা (দাসী), আতা ইবন ইয়াসার মুসায়মান ইবন ইয়াসার, ইবরাহীম ইবন আবদিল্লাহ ইবন মা‘বাদ ইবন আব্বাছ কুরাইব, উবায়দা ইবন সিবাক, উবায়দুল্লাহ ইবন আবদল্লাহ ইবন উতবা আলীয়া বিনত সুবায় প্রমুখ.

মাইমূনাহ (রা.) বলেনঃ নবী (স.)-কে ঘির মধ্যে ইঁদুর পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেনঃ তা ও তার আশপাশ হতে ফেলে দাও। (সহীহ বুখারী ২৩৬)

মায়মূনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, কিছু সংখ্যক লোক আরাফাতের দিনে রসূলুল্লাহ ()-এর সাওম পালন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলে তিনি স্বল্প পরিমান দুধ রসূলুল্লাহ ()-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তা পান করলেন ও লোকেরা তা প্রত্যক্ষ করছিল। তখন তিনি (আরাফাতে) আবস্থানস্থলে ওকূফ করছিলেন। (সহীহ বুখারী 1989)

আলীয়া বিনত সুবা (রাঃ) বলেন, উহুদ পাহাড়ের উপর আমার একটি বকরীর পাল ছিল, তারা মড়কে মারা যাচ্ছিল। তখন আমি নবী (স)-এর বিবি মায়মূনা (রাঃ)-এর কাছে হাজির হয়ে এ ব্যাপারে আলোচনা করি। তখন মায়মূনা (রা.) আমাকে বলেনঃ যদি তুমি এদের চামড়া খুলে নিতে, তবে উপকৃত হতে। আমি জিজ্ঞাসা করিঃ মৃত জন্তুর চামড়া দিয়ে উপকার নেওয়া কি উচিত? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ। একদা কুরায়শদের কিছু লোক একটি মৃত বকরীকে গাধার মত টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন রসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমরা যদি এর চামড়া খুলে নিতে, তবে ভালো হতো। তারা বলেনঃ এটি তো মৃত। তখন রসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ পানি এবং কারাজ (সলম পতা) দিয়ে চামড়া পরিস্কার করলে তা পাক হয়ে যায়। (আবু দাউদ 4126)

ইবন হাজারসহ অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞ মায়মূনা (রা)-এর মৃত্যু হিজরী ৫১ সন বলেছেন। তাঁর জীবনের এটাও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে, একদিন যে সারাফ নামক স্থানে রসূল (স)-এর বিবির মর্যাদা লাভ করে পহেলা মিলিত হন, তার প্রায় ৪৪ বছর পর সেখানেই ইনতিকাল করেন। যে জায়গাটিতে রসূল (স)-এর সাথে বাসর করেন, ঠিক সেখানেই সমাহিত হন। বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হজ্জ আদায়ের জন্য মক্কায় যান। হজ্জ শেষে সেখানেই ইনতিকাল করেন। ইবন আব্বাছ (রা) জানাজার সলাত পড়ান। ইবন আব্বাছ (রা)-এর নির্দেশে লাশ সারাফে আনা হয় এবং সেখানে দাফন করা হয়।

**ছাফিয়্যা বিনতে হুয়ায় ইবন আখতাব (রা)**

ছাফিয়্যা (রা) (610 – 670) ইহুদি গোত্র বনু নাযীরের সর্দার হুইয়াই বিন আখতাব-এর বেটী ছিলেন। হুয়ায় ছিলেন লাবী ইবন ইয়াকুব-এর বংশধারায় হারুন আলাইহিস সালামের বংশধর, মদীনার ইহুদী গোত্র বনু নাদীরে এবং মাতা ‘বাররা’ বিনতে সামাওয়াল ইহুদী গোত্র বনু কুরাইজার সন্তান। ছাফিয়্যার (রা) পিতা ও নানা উভয়ে নিজ নিজ খান্দানের নেতা ছিলেন। প্রাচীনকাল থেকে আরবে বসবাসরত ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁদের দুইটি খান্দান-বনু কুরাইজা ও বনু নাদীর অন্যসব আরব ইহুদী খান্দানের চেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী বলে গণ্য হতো।

ছাফিয়া বলেন, যখন নবী (সঃ) কুবায় (মদীনাতে) এলেন, আমার বাবা ও চাচা সূর্যাস্তের আগে তাকে দেখতে গেলেন। তারা অনেক রাতে বাড়িতে ফিরলেন। আমি তাদের কাছে গেলাম। আমি শুনলাম আমার চাচা বলছেন, ইনিই কি সেই লোক? তুমি কি নিশ্চিত? বাবা বললেন, হা। চাচা বললেন, তুমি কী করবে? বাবা বললেন, আমি তার সাথে দুশমনি করব। [[7]](#footnote-7)

বিয়েঃ তার পহেলা বিয়ে হয় সাল্লামের সাথে, তার সাথে তালাক হলে কিনানার সাথে বিয়ে হয় (627 বা 628 সনের শুরুতে, 17 বছর বয়সে)। বনু কুরাইজার নেতা সালাম ইবন মাশকামর সাথে ছাফিয়্যার (রা পহেলা বিয়ে হয়। এ বিয়ে টেকেনি। কিনানার সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। কিনানা খায়বারের কামূস কেল্লার নেতা ছিল। সাফিয়া কিনানাকে বলেন, তিনি স্বপনে দেখেন যে আসমান থেকে চাঁদ তার কোলে এসে পড়েছে। কিনানা তাকে চড় দেয় ও বলে, তুমি কি মদীনার রাজাকে বিযে করতে চাও? [[8]](#footnote-8)

হিজরী ৭ম সনের ঘটনা। খায়বার যখন মুসলিমদের অধিকারে আসে এবং কামূছ কেল্লার পতন ঘটে তখন কেল্লার ভেতরেই ছাফিয়্যার স্বামী কিনানা নিহত হন এবং ছাফিয়্যাসহ তার পরিবারের অন্যসব সদস্য মুসলিমদের হাতে বন্দী হন। তাঁদের মধ্যে ছাফিয়্যার (রা) দুইজন চাচাতো বোনও ছিলেন।

খায়বারের যুদ্ধে ইহুদীদের সকল নামী-দামী নেতা নিহত হন। নিহতদের মধ্যে ছাফিয়্যার (রা) পিতা এবং ভাইও ছিলেন। কামূস কেল্লার পতন ঘটলে বিলাল (রা) ছাফিয়্যা (রা) ও তাঁর চাচাতো বোনদের সঙ্গে করে রসূল (স)-এর কাছে যেতে থাকেন। ইহুদীদের লাশের পাশ দিয়েই তাঁরা চলছিলেন। রসূল (স) পরে এভাবে তাঁদের বাপ-ভাইয়ের লাশের পাশ দিয়ে আনার জন্য বিলালকে (রা) তিরস্কার করেন।

ছাফিয়্যা বন্দী হন, দিহইয়া কালবীর অংশে পড়ল। পরে রসূল (স.) দিহইয়ার কাছ থেকে তাকে কিনে নেন। তিনি তাকে প্রস্তাব দেন ইসলাম গ্রহণ করে তার বিবি হতে, অথবা ইহুদী ধর্মে থাকতে ও পরিজনের কাছে ফিরে যেতে। তিনি তার বিবি হতে সম্মতি জানান।

আনাছ (রাঃ) বলেন, আমরা খায়বার জয় করলাম, এবং বন্দীদের একত্রিত করা হল। তখন দিহয়া নবী এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! কায়েদীদের মধ্য থেকে আমাকে একজন দাসী দান করুন। তিনি বললেনঃ যাও একজন দাসী নিয়ে নাও। তিনি ছাফিয়্যা বিনত হুয়াইকে নিলেন। তখন একজন নবী এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি বনু কুরায়জা ও বনু নাজীরের সর্দার হুযাইর কন্যা ছাফিয়্যাকে দিহয়াকে দিয়েছেন? ইনি একমাত্র আপনারই উপযুক্ত। তিনি বললেন, তাকে ছাফিয়্যাসহ ডাক। তারপর দিহয়া ছাফিয়্যাসহ হাজির হলেন। যখন নবী (স.) তার দিকে নজর দিলেন, তখন তিনি দিহয়াকে বললেন, তুমি ছাফিয়্যা ছাড়া কয়েদীদের মধ্য থেকে অন্য কোন দাসী নিয়ে নাও। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ছাফিয়্যাকে আজাদ করলেন এবং তাঁকে বিবাহ করলেন। সাবিত আনাসকে বললেন, হে আবূ হামজা! তিনি তাঁকে কী মাহর দিলেন? তিনি বললেন, তিনি তাঁর সত্তাকে মুক্তি দান করেন এবং এর বিনিময়ে তাঁকে শাদী করেন। তারপর তিনি যখন (ফেরার) পথে ছিলেন তখন (আনাছের মা) উম্মে সুলায়ম ছাফিয়্যাকে তাঁর জন্য প্রস্তুত করেন এবং রাতে তার কাছে পাঠিয়ে দেন। নবী (স.) তাঁর সঙ্গে বাসর উদযাপনের পর ভোর হলে ঘোষণা করলেন, যার কাছে যা কিছু আছে তা নিয়ে যেন হাজির হয়। আর তিনি চামড়ার বড় দস্তরখান বিছালেন। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে কেউ পানীয়, কেউ খেজুর ও কেউ ঘি নিয়ে হাজির হল। তারপর এসব মিলিয়ে তারা হায়স তৈরী করেন। আর তাই ছিল রসুলুল্লাহ (স.)-এর ওলীমা। (সহীহ মুসলিম 3563)

ছাফিয়্যা বলেন, আমি রসূলের মত চরিত্রের কাউকে দেখি নি। খায়বার থেকে যখন তিনি সাহবায় পৌঁছলেন, তিনি বললেন, আমি তোমার মার্জনা চাই, সাফিয়া, তোমার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে যা করতে হয়েছে তার জন্য, কারণ তারা আমার বিরুদ্ধে এই এই করেছে। (তাবারানী মুজাম আওসাত)

পহেলা বাসর রাতে আবু আয়ুব আনসারী (রা) রসূল (স)-এর অজান্তে কোষমুক্ত তলোয়ার হাতে সারা রাত রসূলের (স) তাঁবুর দরজায় পাহারা দেন। সকালে রসূল (স) তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেন, এই মহিলার পিতা, স্বামী, ভাইসহ সকল কাছে আত্মীয় নিহত হয়েছে। তাই আমার আশঙ্কা হচ্ছিল, কোন খারাপ কিছু করে না বসে। তাঁর কথা শুনে রসূল (স) তাঁর জন্য দুআ করেন। (হাকিম 6787)

সাফিয়া ও রায়হানাকে বিয়ে করে তিনি আরবে ইহুদী-বিদ্বেষ অবসান করেন।

সাহবাহতে রসূল (স) ছাফিয়্যা (রা)-র সাথে তিন দিন কাটান। ‘সাহবা’ থেকে যখন ছাফিয়্যাকে (রা) নিজের উটের উপর বসিয়ে যাত্রা করেন তখন লোকেরা বুঝতে পারছিল না যে, রসূল (স) তাঁকে বেগমের মর্জাদা দান করেছেন, না দাসী হিসেবে নিজের মালিকানায় রেখেছেন। রসূল (স.) মানুষের এ মনোভাব বুঝতে পেরে একটি পর্দা টানিয়ে ছাফিয়্যাকে (রা) মানুষের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যান। মূলতঃ এ পর্দা দ্বারা একথা জানিয়ে দেন যে, ছাফিয়্যা (রা) দাসী নন; বরং তিনি বেগমের মর্যাদা লাভ করেছেন।

‘সাহবা’ থেকে চলার পথে রসূল (স) ও ছাফিয়্যা (রা)-এর বাহন উটটি হোঁচট খায়। তাতে পিঠের আরোহীদ্বয় ছিটকে পড়ে যান। আল্লাহ তাঁদেরকে অক্ষত রাখেন। পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে আবু তালহা (রা) তাঁর বাহনের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে রসূলের (স) কাছে ছুটে যেয়ে বলেনঃ হে নবি! আপনি কষ্ট পেয়েছেন কি? তিনি জবাব দেনঃ ‘না। তুমি মহিলাকে দেখ।’ সাথে সাথে আবু তালহা কাপড় দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে দিয়ে ছাফিয়্যার (রা) দিকে এগিয়ে যান এবং তাঁর উপর একখানি কাপড় ছুড়ে দেন। ছাফিয়্যা (রা) উঠে দাঁড়ান। আবু তালহা নিজের উটটি প্রস্ত্তত করেন এবং তার উপর রসূল (স) ছাফিয়্যাকে (রা) নিয়ে আরোহন করেন। সাহবা থেকে যাত্রার সময় রসূল (স)-এর হাঁটুর উপর ছাফিয়্যা (রা) পা রেখে উটের পিঠে আরোহন করেন।

মদীনা পেঁছে রসূল (স) ছাফিয়্যাকে সাহাবী হারিছ ইবন নুমানের (রা) বাড়ীতে উঠালেন। হারিছ (রা) ছিলেন রসূল (স)-এর একজন জান-কোরবান সাহাবী। তিনি সানন্দে ছাফিয়্যাকে থাকার জন্য ঘর ছেড়ে দেন। (isaba)

একদা হাফছা ছাফিয়াকে ইহুদীর বেটী বলেন। তিনি রসুল (স.)-এর কাছে জানালে রসুল (স.) সাফিয়াকে বলেন, "তাদের বলবে যে, তোমার পিতা একজন নবী (হারূন), তোমার চাচা নবী (মূছা) এবং তোমার শওহর একজন নবী (মুহম্মদ স.)”। তিরমিযী, নাছায়ী উল্লেখ্য হারুন নবীর বংশধর ছিলেন সাফিয়া

আরবদের মধ্যে আগে থেকে ইহুদীবিদ্বেষ ছিল, সে কারণেই জয়নাব ও হাফছার এমন আচরণ। নবী এ বিদ্বেষ অবসান ঘটান।

একদা রসূল (স) বেগমগণকে সংগে নিয়ে হজ্জের সফরে বের হন। পথে ছাফিয়্যার (রা) বাহন উটটি অসুস্থ হয়ে বসে পড়ে। ছাফিয়্যা (রা) কান্না শুরু করেন। খবর পেয়ে রসূল (স) আসেন এবং নিজের হাতে তাঁর চোখের পানি মুছে দেন। কিন্তু এতেও তাঁর কান্না না থেমে আরও বেড়ে যায়। উপায়ান্তর না দেখে রসূল (স) সকলকে নিয়ে সেখানে যাত্রাবিরতি করেন। সন্ধ্যার সময় রসূল (স) বিবি জয়নাব বিনতে জাহাশ (রা)-কে বলেন, ‘জয়নাব, তুমি ছাফিয়্যাকে একটি উট দিয়ে দাও।’ জয়নাব (রা) বললেন, আমি উট দিব আপনার এই ইহুদীনীকে?’ তাঁর এমন জওয়াবে রসূল (স) ভীষণ নাখোশ হন এবং দুই বা তিন মাস যাবত জয়নাবের (রা) সাথ কথা বলা এবং কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। অবশেষে আয়িশার (রা) মধ্যস্থতায় রসূল (স)-এর এই অসন্তুষ্টি তিনি দূর করান। (আহমদ)

জাসরা বিনতে দিজাজা (রা.) থেকে বর্ণিত, আইশা (রাঃ) বলেছেনঃ আমি ছাফিয়ার মতো আর কাউকে উত্তম খানা পাকাতে দেখিনি। একদা তিনি খানা পাকিয়ে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে পাঠালেন, আমি রাগান্বিত হই এবং পাত্রটি ভেঙ্গে ফেলি। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি, হে রসূলাল্লাহ! আমি যা করেছি, এর কাফফারা কি? তখন তিনি বলেনঃ পাত্রের বিনিময়ে এরুপ পাত্র এবং খানার বিনিময়ে এরুপ খানা। (আবু দাউদ ৩৫৩০, নাছায়ী 3957)

আর একবার আয়িশা (রা) ছাফিয়্যার (রা) দৈনিক গঠন সম্পর্কে একটি মন্তব্য করলে রসূল (স) বলেন, তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যদি তা সাগরেও ছেড়ে দেওয়া হয়, তাতে মিশে যাবে। অর্থাৎ সাগরের পানিও ঘোলা করে ফেলবে। (???) [[9]](#footnote-9)

রসূলের (স) প্রতি ছাফিয়্যার ছিল অন্তহীন ভালোবাসা। রসূল (স) যখন আয়িশা (রা)-এর ঘরে অন্তিম রোগশয্যায় তখন একদিন ছাফিয়্যা (রা)-সহ অন্য বিবিগণ স্বামীকে সেবা করতে একত্র হয়েছেন। ছাফিয়্যা (রা) এক সময় বললেনঃ ‘হে আল্লাহর নবী! আপনার এই সব কষ্ট যদি আমিই ভোগ করতাম, খুশী হতাম।’ তাঁর এমন কথা শুনে অন্য বিবিগণ একে অপরের দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগলেন যেন, তাঁর কথায় তাঁরা সন্দেহ করছেন। তখন রসূল (স) বললেন, ‘আল্লাহর কসম! সে সত্য বলেছে।’ (ইবসে ছাদ, তাবকাত কুবরাতে; আছকালানী ইছাবায় বলেছেন ইবনে ছাদের সনদ হাসান)

ছাফিয়্যা (রা) স্বভাবগতভাবেই ছিলেন অত্যন্ত উদার ও দানশীল। ইবন সাদ লিখেছেন, যে ঘরটিতে তিনি বাস করতেন জীবদ্দশায় তা দান করে গিয়েছিলেন।

হিজরী ৩৫ সনের বিদ্রোহীরা উছমান কে (রা) মদীনায় তাঁর ঘরে অবরুদ্ধ করে। বিদ্রোহীরা যখন খলীফার গৃহে বাইরে সকল সরবরাহ ও যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়, তাঁর বাড়ির চতুর্দিকে পাহারা বসায়, তখন একদিন ছাফিয়্যা (রা) খচ্চরের উপর চড়ে খলীফার বাড়ির দিকে যেতে থাকেন। সংগে দাস ছিল। তিনি আশতার নাখঈর দৃষ্টিতে পড়ে যান। আশতার তাঁর চলায় বাধা দিতে খচ্চরটিকে মারতে শুরু করে। ছাফিয়্যা (রা) বললেন, আমার লাঞ্ছিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি ফিরে যাচ্ছি। তুমি আমার গাধা ছেড়ে দাও। এভাবে গৃহে ফিরে এসে ছাফিয়্যা (রা) হাসানকে (রা) খলীফার ঘরের সাথ যোগাযোগের দায়িত্ব দেন। তিনি ছাফিয়্যা (রা)-এর ঘর থেকে খাবার ও পানি খলীফার বাসগৃহে পৌঁছে দিতেন।

ইবন হাজার বলেছেন, তিনি হিজরী ৫২ সনে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর আগে অসীয়ত করে যান যে, আমার পরিতক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পাবে আমার ভাগ্নে। ইবন হিশাম লিখেছেন তিনি তিরিশ হাজার দিরহাম রেখে যান। ছাফিয়্যা (রা)-এর ভাগ্নে ছিল ইহুদী। এ কারণে লোকেরা তাঁর অসীয়ত বাস্তবায়নের ব্যাপারে দ্বিধা-সংকোচ করতে থাকে। কিন্তু আয়িশার (রা) কানে কথাটি গেলে তিনি লোক মারফত বলে পাঠান, ‘‘লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা ছাফিয়্যার ওসীয়ত বাস্তবায়ন করে।’’ অবশেষে তা বাস্তবায়িত হয়।

একবার ছাফিয়্যা (রা) বলেন, হে রসূলল্লাহ! আমি ছাড়া আপনার অন্য সব বেগমদেরই আত্মীয় আছে। আপনার যদি কোনকিছু হয়ে যায়, আমি কোখায় আশ্রয় নিব? রসূল (স) বলেন, আলীর (রা) কাছে। (صفية بنت حيي يا رسول الله كل ازوجك لو إلى من أوى? علي ?)

ছাফিয়্যার (রা) এক দাসী একবার খলীফা উমার (রা)-এর কাছে অভিযোগ করলেন যে, এখনও তাঁর মধ্যে ইহুদীভাব বিদ্যমান। কারণ, তিনি এখনও শনিবারকে মানেন এবং ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন। উমার (রা) লোক মারফত ছাফিয়্যা (রা)-কে অভিযোগের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জওয়াব দেন, ‘যখন থেকে আল্লাহ আমাকে শনিবারের বদলে জুমআকে দান করেছেন, তখন থেকে শনিবারকে মানার কোন দরকার নেই। আর ইহুদীদের সাথে আমার সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে আমার বক্তব্য, সেখানে আমার আত্মীয় আছে। তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার দিকে আমার নজর রাখতে হয়।’ তারপর তিনি দাসীকে ডেকে জানতে চান, এ অভিযোগ করতে কে তোমাকে উৎসাহিত করছেন? দাসী বলল, শয়তান। ছাফিয়্যা (রা) চুপ হন এবং দাসীকে দাসত্ব থেকে আজাদ করে দেন। (সিয়ার আলামিন নুবালা)

ছাফিয়্যা (রা) থেকে দশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেগুলি জয়নুল আবেদীন, মুসলিম ইবন সাফওয়ান, কিনানা, য়াযীদ ইবন মুআত্তাব প্রমুখ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন।

আলী ইবন হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত; নবী (স.)-এর বিবি ছাফিয়্যাহ (রা.) বর্ণনা করেন, নবী (ইতিকাফ অবস্থায়) মসজিদে অবস্থান করছিলেন, ঐ সময় তাঁর কাছে তাঁর বিবিগণ হাজির ছিলেন। তাঁরা যাওয়ার জন্য রওয়ানা হন। তিনি (আল্লাহর রসূল) ছাফিয়্যাহ বিনতে হুয়ায়্যীকে বললেনঃ তুমি তাড়াতাড়ি করো না। আমি তোমার সাথে যাব। তাঁর [ছাফিয়্যাহ (রা.)]-এর ঘর ছিল উছামার বাড়িতে। এরপর নবী (স) তাঁকে সঙ্গে করে বের হলেন। এ অবস্থায় দুইজন আনসার ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঘটলে তারা নবী (স)-কে দেখতে পেয়ে (দ্রুত) আগে বেড়ে গেলেন। নবী (স) তাদের দুইজনকে বললেনঃ তোমরা এদিকে আস। এ ছাফিয়্যাহ বিন্তু হুয়ায়্যী। তাঁরা দুইজন বললেন, সুবহানাল্লাহ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেনঃ শয়তান মানুষের শরীরে রক্তের মত চলাচল করে। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে তোমাদের মনে কিছু সন্দেহ ঢুকিয়ে দিবে। (বুখারী ২০৩৫, তার লফজ; মুসলিম 5808, আবু দাউদ 2470)

সুহায়রা বিনতে জায়ফার নাম্নী এক মহিলা একবার ছাফিয়্যা (রা)-এর কাছে ভেজা খেজুরের নাবীজ-এর হুকুম সম্পর্কে জানতে চান। ছাফিয়্যা (রা) বলেন, রসূল (স.) এটা নিষেধ করেছেন। (আহমদ)

সাফিয়া (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেনঃ লোকেরা এই কাবা ঘর আক্রমণ করা থেকেও বিরত থাকবে না, এমনকি একটি সেনাদল যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। তারা বায়দা নামক স্থানে পৌঁছলে তাদের অগ্রবর্তী ও পশ্চাদবর্তী দল জমীনে ধ্বসে যাবে এবং তাদের মধ্যবর্তী দলও রেহাই পাবে না। আমি বললাম, যদি কাউকে জোরপূর্বক এই বাহিনীতে শামিল করা হয়? তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের নিজ নিজ নিয়াত অনুসারে উঠাবেন। (তিরমিযী ২১৮৭, আহমদ ৭৮৭৭, ইবন মাজাহ)

**উম্মে রাফি সালমা**

উম্মে রাফি সালমা ছাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের আজাদকৃত দাসী ছিলেন। আবু রাফির বিবি।

উম্মে রাফি সালমা হামজাকে বলেন, (و رأيت ما فعل أبو جهل بابن أخيك) যদি দেখতেন আপনার ভাতিজার প্রতি আবু জেহেল কী করেছে? একথা শুনে হামজা ............ (ইছাবা)

উম্মে রাফি সালমা ........... ক্ষত জায়গায় মেহেদী লাগানো (তিরমিজী??)

উম্মে রাফি সালমা বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমাকে বলুন আমি কীভাবে সালাত শুরু করব? ....... (يا رسول الله أخبرني بشيء أفتتح به صلاتي قال إذا قمت الى الصلاة فكبري سرا الحديث رواه عطاف بن خالد عن زيد عن أم رافع ولم يذكر بينهما واحد).............. (ইছাবা)

**উম্মে বুজায়দ হাওয়া বিনত ইয়াযীদ (রা)**

হাওয়া বিনতে ইয়াযীদ ইবন সিনান/সাকান (أم بجيد حَوّاء بنت يَزِيد) মদীনার আবদুল আশহাল গোত্রের মেয়ে। তিনি মদীনার কায়স ইবন খুতায়মের স্ত্রী ছিলেন। মদীনার মহান আনসারী সাহাবী সাদ ইবন মুআজ (রা) ছিলেন হাওয়ার মা আকরাব বিনত মুআযের আপন ভাই। সুতরাং সাহাবী সাদ ছিলেন হাওয়ার মামা। বদরী সাহাবী রাফি ইবন ইয়াযীদ (রা) হাওয়ার সহোদর। রসূলুল্লাহর (স) মদীনা হিজরতের আগে, মদীনায় ইসলাম প্রচারের সূচনা পর্বে হাওয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। [ইসাবা-৪/২৭৭]

موجز-ما-ذكر-عنها-في-الكتب-الأربعة/أم-بجيد-الأنصارية

মদীনার যে কজন মহিলা সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহর (স) কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে বাইআত করেন, এই হাওয়া তাঁদের অন্যতম।

আবদুল আশহাল গোত্রের এক মহিলা উম্মু আমির বলেছেন, আমি, লাইলা বিনত হুতায়ম ও হাওয়া বিনত ইয়াযীদ- এই তিনজন একদিন মাগরিব ও ঈশার মাঝমাঝি সময়ে আমাদের চাদর ‍দিয়ে সারা দেহ ঢেকে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। আমরা সালাম দিলাম। তিনি আমাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। আমরা পরিচয় দিলাম। তিনি আমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে জানতে চাইলেন: তোমরা কেন এসেছ? আমরা বললাম: ইয়া রসূলুল্লাহ! আমরা আপনার কাছে ইসলামের বাইআত করতে এসেছি। [ইসাবা]

হাওয়া তাঁর স্বামী কায়স ইবন খুতায়মর অজ্ঞাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। স্বামী কায়স জানতে পেরে তাঁকে ইসলাম থেকে বিরত রাখার জন্য তাঁর উপর নির্যাতন আরম্ভ করেন। তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন, সালাতরত অবস্থায় সিজদায় গেলে মাটিতে ফেলে দিতেন। [ইসাবা-৪/২৭৬]

হাওয়া নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করে যেতেন। রসূল (স) তখন মক্কায়। মদীন থেকে যে সকল মুসলিম মক্কায় যেতেন তাঁদের মুখে তিনি মদীনার হাল-হাকীকত অবগত হতেন। তাঁদের কাছেই তিনি হাওয়ার উপর নির্যাতনের কথা অবগত হন। মৃত্যুর পূর্বে একবার কায়াস মক্কার “যুল মাজাজ“-এর মেলায় যান। রসূল (স) খবর পেয়ে তাঁর অবস্থানস্থলে গিয়ে হাজির হন। রসূল (স)-কে দেখে কায়স সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং খুবই সম্মান ও সমাদর করেন। রসূল (স) তাঁকে ইসলাম গহণের আহ্বান জানান। তিনি এই বলে সময় নেন যে, মদীনায় ফিরে গিয়ে আরো একটু চিন্তা করে দেখবেন। রসূল (স) তাতে রাজি হন। তারপর তিনি প্রসঙ্গ পাল্টে বলেন, তোমার স্ত্রী হাওয়া বিনত ইয়াযীদ তো ইসলাম গ্রহণ করেছে। তুমি তাকে নানাভাবে কষ্ট দিয়ে থাক। আমি চাই তুমি আর তাকে কোনভাবে কষ্ট দিবে না। আল্লাহকে ভয় কর। তার ব্যাপারে আমার কথা মনে রেখ। [তাবাকাত-৩/৩২৪;]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি স্ত্রীকে বলেন: তুমি তোমার দীন যেভাবে ইচ্ছা পালন করতে পর। আমি আর কোন রকম বাধা দিব না। আল্লাহর কছম! আমি তাঁর চেয়ে সুন্দর চেহেরা ও সুন্দর আকৃতির কোন মানুষ আর দেখিনি। [বায়হাকী, দালায়িলন-নুবুওয়াহ-২/৪৫৬]

এরপর হাওয়া (রা) স্বামীর কাছে ইসলামের যা কিছু গোপন রেখেছিলেন সবই প্রকাশ করে দেন। প্রকাশ্যেই ইসলাম চর্চা করতে থাকেন। কায়স আর মোটেও বাধা দেননি। প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবরা যখন তাঁকে বলত, তুমিতো পৌত্তলিক ধর্মের উপর অটল আছ, কিন্তু তোমার স্ত্রী মুহম্মাদ (স)-এর অনুসারী হয়ে গেছেন। তিনি বলতেন: আমি মুহাম্মাদকে কথা দিয়েছি যে, আমি আর তাকে কোন কষ্ট দেব না এবং তাকে দেওয়া কথা আমি রক্ষা করব। [উসুদুল গাবা-৫/৪৩১]

এভাবে নির্বিঘ্নে হাওয়া ইসলামী জীবন যাপন করতে লাগলেন। এর মধ্যে রসূল (স) হিজরত করে মদীনায় চলে আসলেন। হাওয়া আরো কিছু আনসারী মহিলাদের সাথে প্রথম পর্বেই রসূলুল্লাহর (স) কাছে উপস্থিত হয়ে বাইআত সম্পন্ন করেন।

আব্দুর রহমান ইবনু বুজায়দ তাঁর দাদী (উম্মে বুজায়দ) হতে, যিনি রসূলুল্লাহ ()-এর কাছে বায়আত করেছেন তাঁর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! মিসকীন আমার দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আমি তাঁকে দেয়ার মত কিছু পাইনা। রসূলুল্লাহ তাকে বললেনঃ তাকে দেওয়ার মত যদি আগুনে পোড়া ক্ষুর ছাড়া অন্য কিছু না পাও তাহলে তাই তার হাতে তুলে দাও। (আবু দাউদ 1667, তিরমিজী ৬৬৫) আবূ ঈসা (রহঃ) বলেন, উম্মে বুজায়দা বর্ণিত হাদিসটি হাসান সহীহ্।

উম্মে বুজায়দ বর্ণনা করেন, রসূল () বলেন, ভিক্ষুককে সাড়া দাও যদিও এটা বকরীর পুড়ে যাওয়া খুর দিয়েও হয়। (اَ تَرُدُّوا الْسَّائِلِ وَلَوْ بظِلْفٍ مُحْرَقٍ) (আহমদ)

উম্মে বুজায়দ বর্ণনা করেন, রসূল () বলেন, তোমরা ইসফার অর্থাৎ চতুর্দিক ফর্সা হয়ে এলে ফজর আদায় করবে। কেননা এতে রয়েছে বিরাট ছওয়াব। (বাজজার, হাদীসটি হাসান) [[10]](#footnote-10)

কায়স ইসলাম গ্রহণ করেননি। তবে হাওয়ার (রা) গর্ভে জন্ম নেওয়া তাঁর দুই ছেলে ইয়াযীদ ও ছাবিত- উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। উহুদ যুদ্ধে ইয়াযীদ রসূলুল্লাহর (স) সাথে অংশগ্রহণ করেন এবং দেহের বারোটি স্থানে আঘাত পান। এদিন তিনি রসূলর (স) সামনে তরবারি হাতে নিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হন। তখন রসূল (স) তাঁকে ‘জাসির’ নামে সম্বোধন করে নির্দেশ দিচ্ছিলেন এভাবে: হে জাসির! সামনে এগিয়ে যাও। জাসির! পিছনে সরে এসো।

আবূ উবায়দার (রা) নেতৃত্বে পরিচালিত “জাসর”-এর যুদ্ধে এই ইয়াযীদ শহীদ হন। [প্রাগুক্ত] আর ছাবিত, ইবন আবদিল বার “ইসতীআব” গ্রন্থে বলেছেন, তাকে সাহাবীদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কায়স ইবন খুতাইমের দুই বোন- লাইলা ও লুবনা ইসলাম গ্রহণ করে রসূলুল্লাহর (স) কাছে বাইআত করেন। [ইসাবা]

**লায়লা বিনতে কানিফ**

লায়লা বিনতে কানিফ ছাকাফী (ليلى بنت قانف) নবীর বেটি উম্ম কুলছুমকে গোসল দিয়েছিলেন।) from Layla bint Qaanif Thaqafiyyah who said: I was among those who washed Umm Kulthoom the daughter of the Messenger of Allah (pbuh) when she died. (Abu Dawood 3157)

অর কিছু জানা যায় না।

**উম্মে হাফীদ হাজীলা**

মায়মূনার বোন। তার একটি ঘটনা বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তার খালা উম্মে হাফীদ বিনত হারিছ ইবনু হাজন (রা.) নবী (স)-কে পনির এবং দব্ব (অনেকটা গুইসাপের মত দেখতে) হাদিয়া দিলেন। তিনি এগুলো তার কাছে আনতে বললেন। তারপর এগুলো তার দস্তরখানে খাওয়া হল। তিনি অপছন্দনীয় মনে করে দব্বগুলো খেলেন না। যদি এগুলো হারাম হতো তাহলে নবী (স.)-এর দস্তরখানে তা খাওয়া হতো না। আর তিনি এগুলো খাওয়ার অনুমতিও দিতেন না। (বুখারী 5443)

**উম্মু আয়ূব**

উম্মু আয়ূব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী (স.) তাদের সাথে অবস্থান করেন। তারা তার জন্য সুস্বাদু খাবার রান্না করেন। তার মধ্যে এই (পিয়াজ-রসুনের) সবজীরও কিছু অংশ ছিল। তিনি তা খেতে অপছন্দ করলেন। তিনি তার সাহাবীদের বললেনঃ তোমরা এটা খাও। আমি তোমাদের কারো মতো নই। আমার আশংকা হচ্ছে (এটা খাওয়ার কারণে) আমার সার্থীকে (ফেরেশতার) কষ্টে ফেলতে পারি। (তিরমিজী 1727, ইবনে মাজাহ 3363, দারেমী 1991, হুমাইদী 334, ইছহাক বিন রাহওয়াই 2087)

**আবূ হিন্দ সালেম বিন আবু সালেম বায়াজী**

নাম সালেম, তার নাম সিনান বলা হয়েছে। (ইছাবা) এবং তার নাম য়াছারও বলা হয়েছে। তিনি ছিলেন বনু বায়াজার মুক্ত ক্রীতদাস। তিনি হেজামা (শিঙ্গা লাগানো) চিকিৎসা শেখেন, ফলে আবূ হিন্দ হাজ্জাম নামেও পরিচিত।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা আবূ হিন্দ নবী ()-এর মাথার তালুতে শিংগা লাগাল। নবী (স.) বলেনঃ হে বনু বায়াজা! তোমরা আবূ হিনদের মেয়েদের বিবাহ করবে এবং তার সাথে তোমাদের মেয়েদের বিবাহ দিবে। এরপর তিনি বলেন, উত্তমরূপে চিকিৎসার বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিংগা লাগানো। (আবূ দাউদ 2102)

ইবনে হাজার বলেন, আবু নুআ্‌ইম তার মারিফাতুস সাহাবা কিতাবে আবু হিন্দ হাজ্জামের হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন, যিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর হেজামা করি, আর তা শেষ হলে রক্ত পান করে ফেলি। আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ, অঅমি তা পান করেছি। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, সালেম, তুমি কি জানতে না, যে রক্ত পান হারাম? আর কখনো এমন করো না।” (তালখীসুল হাবীর 1/30) [[11]](#footnote-11)

হারাম

proceeds bought food for the people of the Suffa and the needy. The Prophet

( يَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ)

৪৭৬৪। মুহাম্মদ ইবনু হাতিম (রহঃ) ... আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় লোক নবী ()-এর কাছে এসে বলল, আমাদের সঙ্গে এমন কিছু লোক দিন যারা আমাদেরকে কুরআন এবং সুন্নাহ শিক্ষ দিবেন। তখন তিনি আনসারদের সত্তর ব্যক্তিকে তাদের সাথে প্রেরন করলেন। তাদের কুররা (ক্বারী সমাজ) বলা হতো। এদের মধ্যে আমার মামা হারামও ছিলেন। তারা কুরআন তিলওযাত করতেন এবং রাত্রে এর অর্থ অনুধাবন ও শিক্ষায় অতিবাহিত করতেন আর দিনের বেলায় (জলাশয়ে গিয়ে) পানি এন মসজিদে রাখতেন এবং কাঠ সংগ্রহ করে তা বিক্রী করে (বিক্রয়লব্ধ অর্থে) সুফফাবাসী এবং নিঃস্ব ফকীরদের জন্য খাদ্য ক্রয় করতেন। এদেরকেই নবী তাদের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। ওরা রাস্তায়ই তাদের উপর আক্রমণ করল এবং তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছর পূর্বে তাদেরকে হত্যা করল। তখন তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের নবীর কাছে সংবাদ পৌছিয়ে দিন যে আমরা আপনার সন্নিধানে পৌছে গিয়েছি এবং আপনার প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছি আর আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন। তিনি রাবী বলেন, এক ব্যক্তি আনাস (রাঃ) এর মামা হারাম (রাঃ) এর পিছন দিক দিয়ে এসে বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করে জান বের করে নিল। হারাম (র) বলে উঠলেন, কাবার মালিকের কসম! আমি সফল হয়েছি। তখন রসুলুল্লাহ (n.) তার সাহাবীগণকে বললেনঃ তোমাদের ভাইগণ নিহত হয়েছেন, আর তারা বলেছেনঃ, হে আল্লাহ আমাদের নবীকে সংবাদ পৌছিয়ে দিন যে, আমরা তোমার সন্নিধানে পৌছে গিয়েছি এ অবস্থায় যে, আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট আর আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

1. আহমদ, ইবনে ইসহাক [↑](#footnote-ref-1)
2. এই ঘটনার পর রাসুল (স.) এর এই বাক্যটি প্রবাদে পরিণত হয়। কেউ কোন ব্যাপারে কাউকে ছাড়িয়ে গেলে বলা হয়, অমুক উকাশার মত এগিয়ে গেছে। [↑](#footnote-ref-2)
3. এ যুদ্ধে তার হাতের তরবারিটি ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। রসুল (স.) তাকে একটি খেজুরের ছড়ি দান করেন এবং তা দিয়েই তিনি সূচালো ছুরির মত শত্রুর ওপর আক্রমণ চালান। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তিনি এ ছড়ি দিয়েই লড়ে যান। (ইসতীয়াব) ইবন সাদ বর্ণনা করছেন: বদরের দিন উকাশা ইবন মিহসানের অসিটি ভেঙ্গে যায়। রসূল (স.) তাকে একটি কাঠের লাঠি দেন। সেটি তার হাতে স্বচ্ছ ঝকমকে কঠিন লোহার তীক্ষ অসিতে পরিণত হয়। (ইবনে হিশাম 1/637 জঈফ ) [↑](#footnote-ref-3)
4. ইসলাম কবুল করলে গোসল ফরজ হয়। বিষয়টি আগের নবীদের যুগেও ছিল। যেমন খ্রিস্টানধর্মে বাপ্তিস্ম বলা হয়। ইসলাম কবুল গোসল ফরজ হওয়ার বিষয়টি মশহুর। ছুমামা বিন উছাল যখন ইসলাম কবুল করেন, তখন গোছল করেন। [↑](#footnote-ref-4)
5. তিরমিজী বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এটাই সঠিক যে রসূল (স) তাঁর কোন বিবিকে তালাক দান করেননি। রসূল (স) জীবনের এক বিশেষ সময়ে যাঁকে বিবিরূপে নেন এবং যিনি অতি দক্ষতার সাথে খাদীজার (রা) দায়িত্ব পালনকরেন, তাকে বার্ধক্যে রসূল (স.) দূরে ঠেলে দেবেন, এমন কথা কেমন করে ভাবা যায়? আধুনিক ইতিহাস লেখকদের অনেকে সাওদা (রা) সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি রসূলের (স.) আদর্শ গৃহিণী হতে পারেননি। এ সম্পর্কিত বিভিন্ন পর্যালোচনা করলে যে তথ্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো, সাওদার জীবনে বার্ধক্য এসে যায়। স্বামীকে তুষ্ট করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। [↑](#footnote-ref-5)
6. সাধারণভাবে একথা প্রসিদ্ধ যে, জয়নাবের (রা) ওলীমা উপলক্ষে ‘আয়াতে হিজাব’ নাজিল হয়। ইবন হাজার এই বর্ণনাগুলির সমন্বয় করেছেন এভাবেঃ হিজাবের আয়াত নাজিলের কয়েকটি কারণ ছিল। তার মধ্যে জয়নাবের ঘটনাটি ছিল সর্বশেষ। আর সেটাই আয়াতের শানে নুজুল। কারণ উক্ত আয়তের মধ্যেই ঘটনাটির প্রতি ইশারা রয়েছে। [↑](#footnote-ref-6)
7. আবু ইয়ালা (মুসনাদ), ইবনে আসাকির (তারিখ দিমাশক), তাবারানী (মুজাম আওসাত)। এই রেওয়ায়েত সঠিক। যদিও কয়েকজন হাদীস স্কলার বলেছেন যে, সূত্রে একজন অচেনা বর্ণনাকারী আছে, তিনি আসলে সাফিয়ার ভাতিজা যিনি তার তত্ত্বাবধানে লালিত হন। ইহুদিরা আশা করেছিল, ওয়াদাকৃত নবী তাদের নিজ গোত্রের মধ্য থেকে হবে। যখন তারা দেখল তিনি ইসমাইলের বংশের তখন তারা তাকে অস্বীকার করল। [↑](#footnote-ref-7)
8. তাবারানী; এখানে আরও বলা হযেছে যে যখন সাফিয়া পহেলা নবীর সাথে সাক্ষাৎ করেন তার গালে চড়ের দাগ তখনও ছিল। [↑](#footnote-ref-8)
9. ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন: আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ছাফিয়্যা (রা.)-কে বিয়ে করে মদীনা এলে আনসারী মহিলাগণ এসে তার ব্যাপারে (আমাকে) জানায়। আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, আমি বেশভূষা পরিবর্তন করে এবং চেহারা আবৃত করে তাকে দেখতে গেলাম। রসূলুল্লাহ (স) আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমাকে চিনে ফেলেন। নবী (স) আমার দিকে লক্ষ্য করলে আমি দ্রুত সরে যেতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে ধরে ফেলে কোলে তুলে নেন এবং বলেন, কেমন দেখলে? আমি বললাম, আমাকে ছেড়ে দিন, ইহূদী নারীদের মধ্যকার এক ইহূদিনী। হাদীসটি উক্ত হাদিসের রাবী ১. মুবারক বিন ফাদালাহ সম্পর্কে আবু বকর বাযযার বলেন, তার হাদীস বর্ণনায় কোন দোষ নেই। আবু বকর বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহনযোগ্য নয়। আবু হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আবু দাউদ ও আবু জুরআহ রাজী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক তাদলীস করেন। নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন য়াকুব জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। ইবনু হাজার আছকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় তাদলীস করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৭৬৬, ২৭/১৮০ নং পৃষ্ঠা) ২. আলী বিন যায়দ বিন জুদআন সম্পর্কে য়াহয়া বিন সাঈদ কাত্তান বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বল ও য়াহয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়াকুব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সিকাহ সালিহ। আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪০৭০, ২০/৪৩৪ নং পৃষ্ঠা) ৩. উম্মু মুহাম্মাদ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযি বলেন, তার হাদীস হাসান। ইমাম যাহাবী ও ইবন হাজার আসকালানী বলেন তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। [↑](#footnote-ref-9)
10. মুহম্মাদ ইবনু ইসহাক-এর সূত্রে শুবা এবং ছাওরীও এই হাদিসটি রিওয়ায়েত করেছেন। আসিম ইবনু উমর ইবনু কাতাদা থেকে মুহাম্মাদ ইবনু আজালানও এটির রিওয়ায়াত করেছেন। এই বিষয়ে আবূ বারযা আসলামী, জাবির ও বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা তিরমিযী বলেনঃ রাফি ইবনু খাদীজ (রা.) বর্ণিত হাদিসটি হাসান ও সহীহ। একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈন অন্ধকার চলে যাওয়ার পর ফজর আদায়ের পক্ষে মত দিয়েছেন। সুফিয়ান সাওরী এ মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাক বলেছেন, (অন্ধকার) ফর্সা হওয়ার অর্থ হচ্ছে- সন্দেহাতীতরূপে ভোর হওয়া। কিন্তু ফর্সা হওয়ার অর্থ এই নয় যে, নামায দেরি করে আদায় করতে হবে। [↑](#footnote-ref-10)
11. ইবনে হাজার বলেন, এই সনদে আবুল হাজ্জাফ আছে, যার ব্যাপারে কথা আছে। আহমদ ও য়াহয়া তাকে ছিকাহ বলেছেন। নাছায়ী বলেন, কোন দোষ নেই। আবু হাতেম বলেন, সালিহুল হাদীস। ইবসে আদী বণলেন, আমার জন্য তার দরকার নেই। (তালখীসুল হাবীর 1/30) [↑](#footnote-ref-11)